GOVERNMENT OF INDIA.
IMPERIAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. AC. 895

Book No. 1.

I. L. 38.

## IMPERIAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35.2.3 | | | |
| 77.7.. | | | |
| 30 MAY 1958 | | | |
| 29 DEC 1959 | | | |

I. L. 44.

MGIPC—S4—III-3-12—24-7-42—5,000.

182. Ac. ৪৯৫. ১.

# ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

প্রথম খণ্ড।

( উৎকল )

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

কলিকাতা ;
২১০/৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
আনন্দ-আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০২।

[ *All rights reserved.* ]

Imp-4291
Dt. 7/10/09
CALCUTTA

30. NOV. 04

# উৎসর্গ।

## শ্রীযুক্তবাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-এল।

শরৎ,

বাল্যকালে, স্কুল-প্রাঙ্গণে, তোমার যে মধুময় ভাবে আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, আজিও আমার নিকট তাহা মধুময়। স্মৃতি বাঁচিয়া থাকুক, আমি তোমার সেই বাল্য মধুর ভাব সম্মুখে রাখিয়া, উত্তপ্ত, কঠোর, নীরস সংসার-মরু,জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, শান্তি ও সুখে উত্তীর্ণ হইয়া যাই।

অনেক ঘুরিয়া, অনেক দেখিয়া, এখন শ্রান্তশরীরে অবসন্ন মনে একটী কথা তোমাকে বলিয়া যাই ;—কথাটী এই, বাল্যকালের মধুর ভালবাসা ও স্নেহ যেমন মিষ্ট, সমস্ত জীবন-সাগর সেঁচিলেও তেমন মিষ্ট জিনিস মিলে না। এখন বন্ধু অনেক পাইয়াছি, কিন্তু সে সকল যেন জীবনশূন্য বন্ধু, যেন স্বার্থ-কাঠের ছবি,—ভাবশূন্য, নীরস, কঠোর। এখন কথা অনেক শিখিয়াছি, কিন্তু সে সকল শুষ্ক শব্দাড়ম্বর মাত্র,তাহা যেন প্রাণশূন্য। আর সেই বাল্যকালে, সেই যৌবন-ঊষায়, আমরা দুইজন, দুইজনের পার্শ্বে, স্কুল-ছুটী হইলে যে দাঁড়াইতাম, তখন কথা ছিল না, অথচ ভাবের জমাট তরঙ্গ যেন উভয়ের প্রাণ-সরসীতে উথলিত হইত,—দুই জন কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নীরবে যে দাঁড়াইতাম, তাহাতে কত মধুর ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। তুমি বাল্যকালে আমাকে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়াছিলে, আর আজ বয়স-প্রান্তরে তুমি বা কোথায়,আমি বা কোথায়! আছে কি? কেবল মধুময় বাল্য-স্মৃতি। তাই বলি, স্মৃতি বাঁচিয়া থাকুক। স্মৃতি না থাকিলে এতদিন মরিতাম।

বলিতেছিলাম, সেই যে ধর্ম্মের পথে আমরা দুইজন ছুটিতে বাহির হইয়াছিলাম,তারপর অনেক দর্শনের পর,অনেক পরীক্ষার পর,এই আমি কে, বুঝিতেছ কি? আমার সমস্ত লেখা,সমস্ত কথার ভিতরে আমার ধর্ম্ম-জীবন-কাব্য লিখিত রহিয়াছে। আমাকে যদি বুঝিতে চাও, সমস্ত পড়িবে, আমাকে যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে চাও, সকল কথা শুনিবে। আমি যে সকল কথা বলিতেছি, এ সকল বলিতে বলিতেই যদি আমার জীবন শেষ হয়,সেই অনন্তধামে, সেই মহিমাময় পুণ্যালোকে নয় আবার উভয়ের মিলন হইবে। শুনিতে আরম্ভ কর, আমি বলিয়া যাই।

তুমি না শুনিলে আর শুনিবে কে ? পৃথিবীতে লোক কি আর নাই ? আছে বটে, কিন্তু আমার নিকট বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন মধুর হইয়া আছ, এমন মিষ্ট, এমন মধুর এই পৃথিবীতে বুঝিবা আর কেহই নাই। মা যেমন সন্তানের নিকট মধুর, সন্তান যেমন মায়ের নিকট মধুর ; স্বামী যেমন স্ত্রীর নিকট মধুর, এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর নিকট মধুর ; এমন আর কি পৃথিবীতে মিলে ? মিলে না বলিয়াই মাতৃ-প্রেমে ও সন্তান-বাৎসল্যে জগৎ মুগ্ধ। মিলে না বলিয়াই দাম্পত্য-প্রেমে জগৎ আত্মহারা। বলিব কি যে, তোমার বাল্য-প্রেম আমার নিকট এ সকল অপেক্ষাও মধুর ! প্রেমের নিকট, রূপ, সৌন্দর্য্য তুচ্ছ, জ্ঞান-বিজ্ঞান তুচ্ছ, ধন ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ। মানুষ আড়ম্বরশূন্য ভাবে প্রেমে মজিতে চায়, কিন্তু সংসারের স্বার্থ তাহাতে বাধা দেয়। ভালবাসায় মজিবার সময় মানুষ কিছু গণনায় আনে না, কেবল প্রেমান্ধ হইয়া ডুবিতে চায়। সেইরূপ ডুবাতেই সুখ। আমি বাল্যে মাতৃ-হারা ; আমি কেবল তোমার মধুর বাল্য-সখ্য-প্রেমে সঞ্জীবিত। তুমি, কেবল তুমিই আমার হৃদয় মন যেন পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া আছ। আর কেহ শুনুক বা না শুনুক, তুমি শুনিলেই আমি চরিতার্থ হই।

আমার কথা নীরবে শুনিয়া, সেই বাল্যকালের ন্যায় নীরবেই থাকিও। শুনিয়া শুনিয়া, তার পর মিলিতে চাও, আবার মিলিও। মিলিতে না চাও, দূরে দূরে, অতি দূরেই উভয়ে চলিয়া যাই। বাঁচিয়া থাকুক কেবল বাল্য-স্মৃতি, বাল্য-প্রেম, বাল্য-ধর্ম্ম। বাঁচিয়া থাকুক সে সবই, যাহা কপটতা-শূন্য, যাহা কল্পনা-শূন্য, যাহা জীবন্ত, যাহা প্রাণস্পর্শী,—যাহা মধুর, যাহা মধুর। তবে আজ যাই।

আনন্দ-আশ্রম।
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩০২।

তোমার অকৃত্রিম স্নেহের
দেবীপ্রসন্ন।

# ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

## উৎকল।

### সাগরসঙ্গম ও চাঁদবালী।

উড়িষ্যা, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপের এক প্রাচীন দুর্গ। এক-দিকে, ধউলি পর্ব্বতে অশোকের প্রস্তরলিপি ও অনুশাসন, উদয়গিরি রাণীহংসপুর প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন গুহা, ললিতগিরি ও খণ্ডগিরির অক্ষয় বৌদ্ধকীর্ত্তি, ভুবনেশ্বরের অবিনশ্বর অপূর্ব্ব কারুকার্য্যপূর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত গগনভেদী অসংখ্য মন্দির, কণারকের অপূর্ব্ব অরুণ-স্তম্ভ, জাজপুরের বিরজা-মন্দির, শুভস্তম্ভ, সপ্তমাতৃকা, মুক্তিমণ্ডপ প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি উদার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মক্ষেত্র পুরুষোত্তমের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ব্যাপার সকল দেখিলে উড়িষ্যাকে হিন্দু রাজত্বের চিরোজ্জ্বল ধর্ম্ম-ইতিহাসের এক-খানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া মনে হয়। অপর দিকে, চিল্‌কা হ্রদের অপরূপ শোভা, মহেন্দ্র-পর্ব্বতশ্রেণীর অসংখ্য পর্ব্বতমালার বিচিত্র শোভা, এবং সর্ব্বোপরি পুরীতটে বঙ্গোপসাগরের আশ্চর্য্য তরঙ্গ-লীলা দেখিলে উড়িষ্যাকে প্রকৃতির এক অক্ষয় শোভার ভাণ্ডার বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যা, প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অক্ষয় ভাণ্ডার। এ সকল যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝান বড় কঠিন। কিন্তু যাহা দেখিয়া নিজে মোহিত হইয়াছি, এবং অসংখ্য ব্যক্তি মোহিত হইতেছেন, তাহার কথা আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। আমরা জানি, এ চিত্র নিতান্ত অস্পষ্ট হইবে, কেন না, সে অতুল কীর্ত্তি ও অতুল শোভা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইবার নয়। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমরা ১৭ই ফাল্গুন (১২৯৫), দোলযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, রাত্রি

আনুমানিক ১২ ঘটিকার সময় সি-গল (sea-gull) নামক জাহাজে আরোহণ করিলাম। আমরা জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ;—মনে হইল, আরো পূর্ব্বে আসিলে ভাল হইত। স্ত্রী পুরুষের এরূপ একত্র সমাবেশ, এরূপ ঘেঁষাঘেঁষি ও মেশামিশি ভাব আমরা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। তীর্থযাত্রীগণের সে উল্লাস, সে জীবন্ত উৎসাহ, সে কোলাহল—অনেক দিন ভুলিতে পারিব না। যে যেখানে স্থান পাইয়াছে, জাহাজের উপর পড়িয়া গিয়াছে, কাহারও পায়ের নীচে কাহারও মস্তক, পরস্পরের দেহে দেহে সূচীভেদ্য যোগ—আব্রাহ্মণ চণ্ডালের শরীরের ঘেঁষাঘেষিতে জাহাজে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। দেখিলে বোধ হয়, জাহাজ খানি যেন পুরুষোত্তমের এক উজ্জ্বল ছবি। ঠিক পুরীর ন্যায় এখানে জাতিভেদ নাই,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক অবস্থাপন্ন। আর পাণ্ডাগণের খোসগল্প, উল্লাস, অঙ্গ-ভঙ্গি, যাত্রীগণের নিকট বীরত্ব প্রকাশ,—জাহাজের এ সকলই শ্রীক্ষেত্রের ন্যায়। এ পথের নেতা পাণ্ডাগণ। জাহাজের কর্ত্তাই যেন পাণ্ডাগণ। আমাদের সহিত কোন পাণ্ডা ছিল না;—সুতরাং ক্ষণকাল আমরা স্থান পাইলাম না। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গের বন্ধু একটু স্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অতি কষ্টে দেহ দুখানিকে রাখিবার জন্য যে স্থান পাওয়া গেল, তাহার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হইল, এবং কিছু তীব্র ভর্ৎসনা বা গালিগালাজ পর্য্যন্ত সহিতে হইল। কেহ কেহ আমাদের সহিত বিষম ঝগড়া করিল। কোলাহলে সে রাত্রি আর নিদ্রা আসিল না। অতি কষ্টে রাত্রি চলিতে লাগিল। শুনিলাম, ৭০০ আরোহী জাহাজে আরোহণ করিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন লোক পুলীস যাইয়া জাহাজে লোক অন্বেষণ করিতেছে। তাহারা যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, অবিভেদে স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখের আবরণ তুলিয়া দেখিয়া যাইতেছে। ফাল্গুন মাসের রজনী, হিমের ভয়ে কেহ কেহ মুখাবৃত করিয়া নিদ্রাকর্ষণ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলে, সেই অনুসন্ধানকারী লোকেরা বলিল, একটী কুলবধূ এক বৎসরের একটী ছেলে ঘরে রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। ইহার পর পাণ্ডাদিগকে নানা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা জাহাজের অন্য দিকে চলিল। ঘটনাটী আমাদের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। কোলের ছেলে রাখিয়া মা আসিয়াছেন!

ধর্ম্মের জন্য ?—না আর কিছুর জন্য ? যদি ধর্ম্মের জন্য হয়—সে মা দেবী। আর যদি না হয় ?—ভাবিতে পারা গেল না—বড়ই ক্লেশ হইল।

ভাবিতে ভাবিতে, কোলাহল শুনিতে শুনিতে, এত লোকের উষ্ণ নিশ্বাস সহিতে সহিতে এবং খালাসী ও যাত্রীগণের গতায়াতের পদধূলি বহিতে বহিতে—সেই কষ্টের রজনী অবসান হইয়া আসিল। জাহাজের বাঁশী তীব্র আওয়াজ ছাড়িল, আগুনে ধূম উঠিল;—খালাসিগণ নোঙ্গর তুলিল,—অতি প্রত্যূষে জাহাজ কলিকাতা বন্দর ছাড়িল। ছাড়িবার একটু পূর্ব্বেও জাহাজে যাত্রী উঠিল। তখন ভাবিলাম, আমরা মূর্খ, সমস্ত রাত্রি বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম, শেষ রাত্রে জাহাজে উঠিলেই বেশ হইত!

জাহাজ চলিল; গ্রামের পর গ্রাম, তারপর গ্রাম—সব ছাড়িয়া উদ্দাম বেগে, ভীম গর্জ্জনে অনন্ত সাগরের উদ্দেশে ছুটিল। রজনীতে যাহারা আমাদের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, দিবসে চক্ষুলজ্জাবশতঃ তাহারা আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিল, তাহারা বাঙ্গালী।* আমাদের পশ্চাতে একটী হিন্দুস্থানী স্থান লইয়াছিল, সে রাত্রেই আমাদিগের প্রতি সংব্যবহার করিয়াছিল। শিয়রে দুইজন উৎকলবাসী লোক, তাহারও আপনার হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টার সময় জাহাজ হীরকবন্দরে ( Diamond Harbour ) উপস্থিত হইল। নদী ক্রমেই পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আমরা অবাক্ হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। তীর ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, কূল অকূলে মিশিল। বেলা দুই ঘটিকার সময় আমরা কূল ত্যজিয়া অকূল বঙ্গোপসাগরের অগাধ নীল বারিরাশিতে ভাসিতে লাগিলাম। যাত্রীগণের উল্লাস বাড়িল বটে, কিন্তু সে কি জন্য, জানি না। উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে অতল জল,—কেবল শব্দ, কেবল গর্জ্জন, চতুর্দ্দিকে কেবল নীলজল, কেবল নীলজল! আমরা আর কখন সাগর দেখি নাই, আমরা সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। সে দিন সমুদ্র স্থির ছিল, আমাদের দেখিবার বিশেষ সুবিধা হইল। কিন্তু একটী দৃশ্য আমাদের ভাগ্যে দেখা ঘটিল না। শুনিয়াছিলাম, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ যখন অস্থির হয়, তখন শত শত ব্যক্তি পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয় লয়, মাথাঘুরণিতে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। কিন্তু আমরা সে দৃশ্য

---

* ইহার সম্বন্ধে পরে আরও কথা বলা যাইবে।

দেখিলাম না। সাগরের সৌন্দর্য্য প্রচুর দেখিলাম। আর যাত্রীগণের বিকট চীৎকার, সমস্ত দিনব্যাপী কর্কশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাণ ঝালা পালা হইল। অবিশ্রান্ত তালমানশূন্য উদ্গীরিত গান শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা জন্মিল। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া সাগরের অতুল শোভা দেখিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পর দেখিলাম, সেই অকূল সাগরে একটী প্রকাণ্ড সর্প নির্ভয়ে পাড়ী ধরিয়া যাইতেছে। কোথায় বা তার বসতি, কোথায় বা যাইবে, কতদূর বা যাইবে, অকূল জল কত বা পার হইবে;—আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইলাম না, প্রাণে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু সে নির্ভয়ে তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, সাগরের গভীরতা ভাবিতে ভাবিতে, দিন শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইলেন, ভয়ে যেন কম্পিত-কলেবর হইলেন। আহা, উপরের সেই অনন্ত নীলাকাশের সহিত নিম্নের সেই অতল নীলজল মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—সূর্য্য আকাশ ছাড়িয়া সাগরে ডুবিতেছেন! সমস্ত দিন জ্বলিয়া ও জ্বালাইয়া এখন যেন শীতল হইতে যাইতেছেন। মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে লজ্জায় আরক্তিম মুখ যেন লুকাইতে যাইতেছেন! আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজ নাই। লোক সকল অনিমেষ নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, সাগর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-বাহু দ্বারা সূর্য্যকে আলিঙ্গন করিতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে। সে আলিঙ্গন, সে যুগল-মিলন, সে মধুর প্রেমাবগাহন দেখিয়া বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। পাহাড়ের অভ্রভেদী শিরে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছি, প্রান্তরের শেষ সীমায় সূর্য্যের রশ্মি ফেলিয়া সূর্য্য পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়াছি, গভীর অরণ্যের ভিতরে সূর্য্যের শেষ জ্যোতি হারাইয়া ফেলিতেও দেখিয়াছি; কিন্তু সাগর সূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে, অথবা সূর্য্য সাগরকে আলিঙ্গন করিতেছেন—এমন মধুর, এমন মনোহর, এমন বিচিত্র দৃশ্য আর দেখি নাই। ধীরে ধীরে সূর্য্য সেই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গময় সাগর জলে অবগাহন করিলেন!! অপরূপ দৃশ্য! সাগরের মধ্যে একটী সন্ধ্যা দেখিয়া আমরা নবজীবন পাইলাম। শত শত নরনারী অস্তমিত সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। আমরাও সেই সময়ে বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা দেখিয়া বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। উড়িষ্যা যাত্রার প্রথম দিন, আমাদিগের নিকট স্বর্গের শোভার দ্বার যেন খুলিয়া দিয়া যাইল। আমরা গভীর ভাবে ডুবিলাম, আমরা মজিলাম। এই অনুপম স্বর্গীয় শোভা যখন শেষ হইল, এবং যখন অন্ধকার আসিয়া সাগরকে

ক্রোড়ে করিয়া বসিল, যখন চতুর্দ্দিকের উর্ম্মিমালা মহা আঁধারে ডুবিল, তখন আমরা ক্ষণকাল চকিত নয়নে জাহাজের পার্শ্বের জলরাশির শোভা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জাহাজের আঘাতে আঘাতে লবণাক্ত সাগর-জল কেমন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিকণা সকল বিকীর্ণ করিতেছে;—জল যেন শত শত নক্ষত্রের বেশ ধরিয়া জ্বলিতেছে;—সেই রাশি রাশি ঈষৎ নীল ফেণার মধ্যে, জোনাকীর ন্যায় জলের ঝক্‌মকী দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল! আমরা আত্মহারা হইলাম। দেখিতে দেখিতে শেষে আর দেখিতে ইচ্ছা হইল না। আমরা সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম করিলাম। ইত্যবসরে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় বৈতরণী নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিল,—এবং অল্পক্ষণ পরেই চাঁদবালীতে জাহাজের লোক সকলকে অবতরণ করিতে হইল। সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম; এদিকে জাহাজের খালাসীগণের বিকট চিৎকার ও অশ্লীল গান শুনিতে শুনিতে আমরা সেই বালিময় স্থানে দ্রব্যাদি লইয়া নামিলাম। মুটের সাহায্যে একটি ঘর ভাড়া করিলাম। আমাদের সেই হিন্দুস্থানী যাত্রীবন্ধু আমাদের সঙ্গ ছাড়িল না,—এক ঘরেই থাকিল। সে দিন আর অন্নাহার হইল না—কষ্টে রজনী যাপন করিলাম।

প্রাতে চাঁদবালী দেখিলাম। চাঁদবালীর নাম অনেক দিন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, বৈতরণী নদী ভিন্ন সেখানে দেখিবার উপযুক্ত আর কিছুই নাই। ৩খানি জাহাজের লোক সেদিন কটক যাইবার জন্য চাঁদবালীতে অপেক্ষা করিতেছিল। সেখানে অনেকগুলি যাত্রী নিবাস। আর চতুর্দ্দিকে কেবল ধূলি। আমরা প্রাতে কোন প্রকারে আহারের কার্য্যটা শেষ করিয়া কটকের জাহাজ ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, যে জাহাজ ১০টার সময় ছাড়িবে, কথা ছিল, সেই জাহাজ ৩টার পূর্ব্বে চাঁদবালা ছাড়ল না। এই ৪।৫ ঘণ্টা ষ্টীমার-টিকিট-ঘরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইল। টিকিট-বাবু এমন সত্যবাদী, এখনই জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া টিকিটের টাকা লইলেন, কিন্তু জাহাজ কিছুতেই ৩টার পূর্ব্বে ছাড়িল না। পাছে, আমরা অন্য জাহাজে যাই, এজন্য বাবু এইরূপ সত্য পথ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে নিদারুণ সূর্য্যের তাপে, এবং উত্তপ্ত বালুকণায় দগ্ধ করিলেন। মনে ভাবিলাম, বাঙ্গালী জাতি কতদিনে সত্যপ্রিয় হইবে!

চাঁদবালীর সে কষ্ট, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। অবশেষে জাহাজ যখন ছাড়িল, তখন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সে কথা পরে বলিব।

## কটকের পথে।

চাঁদবালীর দুটী ঘটনার কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। সেই দুটী ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কটক যাত্রার অন্যান্য কথা বলিব।

যে দিন আমরা কটক রওয়ানা হইব, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে, আহারান্তে আমরা দেখিলাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, কঙ্কালাবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দ্দিকে আহার অন্বেষণ করিতেছে। বন্দরের কুকুরদের সহিত তাহারা যেন এক জাতি হইয়া গিয়াছে ; দেখিলাম, যাত্রীগণের যৎসামান্য ভুক্তাবশেষ নিক্ষিপ্ত হইলেই এক-দিকে কুকুর অন্য দিকে এই শ্রেণীর মনুষ্যেরা ছুটিয়া যাইয়া মৃত্তিকায় পতিত ভাত, ডাইল তুলিয়া মুখে দিতেছে। কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! এই চিত্র দেখিয়া দুঃখ-পূর্ণ পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়িল। দেখিলাম, অনাহারে তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে—যেন অস্থি রাশির উপর একখণ্ড চর্ম্ম মাত্র আবৃত রহিয়াছে। যাত্রীগণ যেস্থানে ভুক্তাবশেষ পরিত্যাগ করেন, সে স্থান অতি কদর্য্য, অতি অপরিষ্কার। দেখিলাম, সেই স্থান হইতেই কেহবা দুই চারিটী অন্ন, কেহ বা ভাতের মাড় খাইয়া অশাসিত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। এরূপ বিষাদের চিত্র, মানবজাতির এরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল! দেশের ধনী লোকদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্মরণ করিয়া এবং ইহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া, পৃথিবীর অসাম্যের প্রতি বড়ই ঘৃণা জন্মিল। অবস্থাপন্ন লোকদিগকে মনে মনে বারম্বার ধিক্কার দিলাম। আমাদের সঙ্গের বন্ধুকে এইরূপ একজন ক্ষুধা-কাতর ব্যক্তিকে দেখাইলাম, এবং আমাদের নিকট যে কিছু আহারের দ্রব্য ছিল, তাহা তাহাকে দিলাম। নীরবে তাহা গ্রহণ করিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া যাইল। আমরা শূন্য প্রাণে, ব্যথিত হৃদয়ে ষ্টীমার ষ্টেসনে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলাম।

এই মর্ম্মভেদী চিত্রের সম্মুখেই আর একটী আশ্চর্য্য চিত্র দেখিলাম। দেখিলাম, কলিকাতার সৌখীন বাবুরা বেশ্যাদিগকে লইয়া তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং চাঁদবালীর যাত্রী-নিবাস সকলকে পবিত্র করিতেছেন!

অনুসন্ধানে জানিলাম, অনেক লোক তীর্থের ভাণ করিয়া আসিয়া বিদেশে নানারূপ স্বেচ্ছা-বিহার ও এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। তাহাদের উল্লাস, তাহাদের অহঙ্কারস্ফীত গর্ব্বিত মূর্ত্তি, তাহাদের রিপুর দুর্দ্দমনীয় পরাক্রমের কথা ভাবিলে মনে হয় না, তাহারা জানে যে, বিধাতার রাজ্যে মৃত্যু নামে তাহাদের জন্য কোন অবস্থা রহিয়াছে। অথবা জানিলেও তাহারা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন,—মহা মোহে, সদা অন্ধ! রূপ ডুবিবে, রিপুর অত্যাচার থামিবে, সংসারের বিলাসের ক্ষণ-গৌরব শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে,—হায়, তাহারা একথা একবারও ভাবে না! ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রকোপ দেখিয়া প্রাণে আরো ব্যথা পাইলাম। ভারতের কত শত রমণী আজ পিতা মাতার পবিত্র ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, বাজারে, রাস্তায় রাস্তায় মানুষকে কলঙ্কে ডুবাইতে ঘুরিতেছে; আর কত যুবক স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসায় মন বাঁধিতে না পারিয়া, পারিবারিক সুখে কলঙ্ক ঢালিয়া, এই কুলটাদিগের পদানত ভৃত্য হইয়া রাস্তায় রাস্তায়, বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ভাবিলেও প্রাণ ফাটিয়া যায়! যাক্, সে সকল মর্ম্মভেদী কথায় আর কাজ নাই।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম। ৩ টার পর আমাদের ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর জাহাজ ছাড়িল। ক্ষুদ্র বৈতরণী নদীতে আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজ গর্জ্জন করিয়া, সুর তুলিয়া, তরঙ্গ ঠেলিয়া ভাসিয়া চলিল। বৈতরণী নদীর যে স্থানে যাত্রীরা তীর্থ করেন, সে স্থানের নাম জাজপুর, তাহা অনেক দূর, তার কথা পরে বলিব। আমরা একে উত্তপ্ত বালুকা-দগ্ধ, তাতে প্রচণ্ড রৌদ্র তখনও ভয় দেখাইতেছে, নদীতে লবণাক্ত জল, এদিকে জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ, আমাদের দারুণ পিপাসা। শুনিলাম, জাহাজের উপরের মহলে মাঝীদের কাছে মিষ্টজল আছে। কিন্তু সেই জল উদ্ধার করা সামান্য ব্যাপার নয়। স্ত্রীপুরুষের ঘনীভূত সমাবেশ; সেই ঘনীভূত মিলন-রাশির ভিতরে পদক্ষেপ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমাদের বন্ধু এই কার্য্যোদ্ধার করিতে আমাকেই পাঠাইলেন। অতি বিনীতভাবে, অতি সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে লক্ষ্যস্থানে পৌছিলাম। যে মিষ্ট কথায় জগৎ বশ, তাহার সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইল। কতকটা মিষ্টজল পাওয়া গেল। দেখিলাম, যেথানে মিষ্টজল ছিল, তার অতি নিকটে দুটী শিষ্ট ভদ্র বাঙ্গালী বসিয়া আছেন। জাহাজে আর ভদ্র বাঙ্গালী নাই। অধিকাংশই স্ত্রীলোক, অধিকাংশই

পুরীর পাণ্ডা। পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বা সভ্য যাত্রী জাহাজে দুই চারিজন ভিন্ন নাই। যাঁহারা উপরে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা কটকের লোক। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী ভাল লোক দেখিলাম। তাঁহাদের মিষ্ট হাসি, মধুর সঙ্গীত, মিষ্ট কথা এই লোক-মরুভূমির মধ্যে অনেকটা শান্তি দিল। আমাদের প্রতি, কি জানি কেন, জাহাজের লোকেরা একটু সদয় ব্যবহার করিল। আমরা যে কামরায় ছিলাম, সে কামরায় অযোধ্যার কোন তালুকদার-পত্নী পর্দ্দার আড়ালে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গের ১৫।২০ জন দাস দাসীও সেই কামরায় ছিল। আমাদের অপর পার্শ্বে, ঠিক সম্মুখে, একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য—চারিটি অল্পবয়স্কা বাঙ্গালীর মেয়ে, সঙ্গে ২।৩ জন পাণ্ডা ও একটি মাত্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও ভূষণাদি দেখিয়াই ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া মনে করা গেল। আমরা তাঁহাদিগকে এরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম এবং সসম্ভ্রমে অপর পার্শ্বে আমাদের যৎসামান্য বিছানা বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে অযোধ্যার তালুকদার-পত্নীর সঙ্গীয় দুইজন দাসী বাঙ্গালীর মেয়ে কয়েকটিকে বড়ই অপমান করিল। ঘটনাটি আমার সঙ্গের বন্ধু দেখিয়া মর্ম্মে বড় আঘাত পাইলেন। দেখিলেন, অপমান সহ্য করিয়া মেয়ে কয়েকটি জড়সড় হইল, কিন্তু সঙ্গে এমন লোক নাই যে, কেহ ইহার প্রতিবিধান করে। বন্ধু হৃদয়ে আঘাত পাইয়া আমাকে ঘটনাটি বলিলেন। পরামর্শ ঠিক করিয়া, আমরা মেয়েদের সঙ্গের পাণ্ডাকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডাকে যখন ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আমি চাহিয়া দেখিলাম, সেই সময়ে বৃদ্ধা বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। পাণ্ডার উত্তর গুলিও বড় গোলমেলে বলিয়া বোধ হইল। মেয়েদের সহিত অভিভাবক নাই কেন, কেমন করিয়া ইহারা আসিল, কোথা হইতে ইহাদিগকে পাইলে—এ সকল কথার কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। নিকটস্থ একজন পাণ্ডাকে দেখাইয়া বলিল, ঐ পাণ্ডা সবিশেষ জানে। সে পাণ্ডাকেও ডাকা হইল। সে নানারূপ অযৌক্তিক এবং অসত্য কথা বলিতে লাগিল। এই গোলমালের সময় সেই বৃদ্ধা পাণ্ডাদিগকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিল এবং বলিল, "বল যে আমরা গণেশ পাণ্ডার যাত্রী, তোমরা গোলমাল কর ত তাহাকে টেলিগ্রাম করিব।" মেয়ে বুদ্ধি চমৎকার, মনে করিল, ইহাতেই আমরা ভয় পাইব। বড় ভয়ের কথাই বটে!! তাহাদের

ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমাদের ক্রমে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। বৃদ্ধার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানা রকম মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম, এই মেয়ে কয়েকটীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া চক্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই সময়ে মেয়েদের মধ্যেও পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তাহাতে বুঝা গেল যে, অভিভাবক সঙ্গে যাইবে, এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন মেয়েকে আনিয়াছে; কিন্তু কোথাকার মেয়ে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, একশ্রেণীর লোক, ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে তীর্থের ছলনায় ভুলাইয়া, ঘরের বাহির করিয়া, নানা প্রলোভনে ফেলিয়া চরিত্র নষ্ট করে। যখন তাহারা কুলে উঠিতে পারে না, তখন আত্মীয় পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাজারের দলে প্রবেশ করে। যাহারা এই ঘৃণিত কার্য্যের ঘটকালি করে, তাহারা মধ্য হইতে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। এই ব্যবসা এ দেশে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এদেশে কন্যাবিক্রয় প্রথা দিন দিন বাড়িতেছে, এই কথার সহিত বর্ত্তমান ঘটনাটীর বড়ই মিল হইল। কিন্তু আমাদের কিছুই করিবার শক্তি নাই, নীরবে সেই বিষাদময় চিত্রের ধারে বসিয়া ইহাদের কার্য্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সমস্ত রাত্রি যে সকল ঘটনা হইল, তাহা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না। দেখিলাম, সেই পাণ্ডা দুটী মেয়েদের গা ঘেসিয়া বসিতেছে, মুখে পান তুলিয়া দিতেছে, কখনও হাত ধরিতেছে, রসের হাসি হাসিতেছে, কখনও মেয়েদের গা ঠেসিয়া শুইতেছে। একটী মেয়ে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা-প্রযুক্ত পাণ্ডার সহিত এক বালিসে শুইতে চায় না বলিয়া বৃদ্ধার দ্বারা খুব তিরস্কৃত হইল। এই রূপ নানা ঘটনা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। মেয়েদের মধ্যে দুটীকে একটু শান্তপ্রকৃতি ও পবিত্রস্বভাব বলিয়া বোধ হইল, আর দুটীর চরিত্রে দোষ স্পর্শিয়াছে, অনুমান হইল। তাহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে হৃদয় উত্তেজিত হইল। কিন্তু কি করিব, আমরা নিরুপায়। দুই একবার পাণ্ডাদিগকে ভর্ৎসনা করা ভিন্ন আর কোন উপায় পাইলাম না।

রাত্রি ৯টার পর আমাদের জাহাজ এলবা (Alba) দ্বার দিয়া কেন্দ্রাপাড়া খালে প্রবেশ করিল। বাঙ্গলায় যেমন রেলের কীর্ত্তি; উড়িষ্যায় সেই রূপ খালের কীর্ত্তি। উড়িষ্যার বড় বড় নদী সকল বাঁধিয়া, সেই সকল নদীর জল খাল দিয়া চালান হইতেছে। খালের দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে,

খালের জলের দ্বারা কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এবং নিকটবর্ত্তী লোকদিগের জলের কষ্ট নিবারিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের স্মৃতিময়ী যে সকল অক্ষয় কীর্ত্তি আছে, সেই কীর্ত্তির পার্শ্বে ইংরাজ রাজত্বের এ কীর্ত্তি নিতান্ত সামান্য নয়। পার্ব্বতীয় প্রদেশের নদীর জল এরূপ বাঁধা না পড়িলে কোন কার্য্যেরই উপযোগী হইত না—সামান্য ঝরণার ন্যায় বহিয়া সাগরে পড়িত। কিন্তু ধন্য ইংরাজ-বুদ্ধি—মরুভূমিকে শীতল বারিতে পরিপূর্ণ করিয়া উড়িষ্যায় কি অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিয়াছে!

কটকের একদিকে কাঠজুরী ও অন্য দিকে মহানদী। কাঠজুরী মহানদীর শাখাবিশেষ। মহানদী হইতে যে স্থানে কাঠজুরী পৃথক হইয়াছে, তাহার নিকট একটী বাঁধ আছে। মহানদীতে জেব্রার নিকটে আর এক প্রকাণ্ড বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বাঁধের নাম এনিকট (Anicut)। জেব্রার নিকট নদীর প্রসার প্রায় তুই মাইল হইবে। ইহার উত্তরে মহানদীর অন্য শাখা বিরূপাতে আর একটী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। মহানদীর প্রবাহিত জলরাশি এইরূপে বাঁধত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া, তালদণ্ডা খাল, কেন্দ্রাপাড়া খাল, এবং হাইলেবেল খাল (ভদ্রক পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে) দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে। জলের সমতা রক্ষা করিবার জন্য এবং নৌকা প্রভৃতি যাতায়াতে জল নিঃশেষ না হয়, এই জন্য, এই সকল খালে মধ্যে মধ্যে (লক্‌গেট) কপাট-দ্বার করা হইয়াছে। বাগবাজারের খালের কপাটী দ্বারের ন্যায় এই সকল খালে অসংখ্য লক্‌গেট আছে। এই সকল গেট পার হইতে অনেকটা সময় লাগে। এই সকল গেটের নিকটে জাহাজ আসিলে, আরোহীগণ মলমূত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য তীরে অবতরণ করে। রাত্রে যখন জাহাজ এইরূপ গেটে গেটে লাগিতে লাগিল, তখন ঐ মেয়েরা পাণ্ডাদের সহিত তুই তিন বার কূলে উঠিল। অল্পবয়স্কা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়েদের এরূপ স্বেচ্ছাবিহার, পুরুষের সহিত এরূপ স্বেচ্ছা-মিলন, এরূপ স্বাধীনভাবে কথোপকথন, তীর্থপর্য্যটনের সময় ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল নামধারী পাণ্ডারা এ দেশে আগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই পাণ্ডাদের বেতনভোগী গোমস্তা মাত্র। কেহ ১॥০, কেহ ২৲, কেহ ৩৲ টাকা কেহ বা তদূর্দ্ধ বেতন পাইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহারা বাহ্যিক ধর্ম্মের চটক তিলক মালা প্রভৃতি ধারণ ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম-কার্য্য করে বলিয়া

জানি না। সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ইহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সামান্য ভৃত্যের ন্যায় যাত্রীদিগের সেবা করে। সেই সেবার খাতিরে যাত্রীদের সহিত ইহাদের এত ঘনিষ্টতা জন্মে যে, যাত্রী-মেয়েদের আর অধিক কিছু অনিষ্ট না হইলেও, স্ত্রী-জনোচিত লজ্জা শরম, বিনয়, গুরুমর্য্যাদা প্রভৃতি ইহাদের কোমল ও মধুর চরিত্রকে একেবারে পরিত্যাগ করে। তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিলে অল্পবয়স্কা মেয়েরা যে চঞ্চল হয়, অস্থিরমতি হয়, লজ্জাহীন হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখা বিষম দায়। তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ শ্রীক্ষেত্র। এখানে এক দিকে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোজ্জ্বল উদার পবিত্র ভাব রক্ষা পাইতেছে, দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মন্দিরের অসংখ্য অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম-ছবি দেখিলে তেমনি মানুষের মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়। এমন ঘৃণিত ছবি মানুষের কল্পনায় সৃষ্ট হয়, ভাবিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু শুনিলাম, উড়িষ্যায় এই সকল তত্ত্ব নাকি শিক্ষানীয় বিষয়, জানিনা এ কথা কতদূর সত্য। যাক্, পাণ্ডাদের লজ্জাশরম-শূন্য ব্যবহারেও যাহারা পবিত্র থাকিতে পারে, তাহারা এই সকল কদর্য্য ছবি দেখিলে কেমনে যে লজ্জা শরম রাখিয়া বাড়ীতে ফিরিবে, বুঝি না। সে সকল ছবির কথা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব। সে সকল ছবির অশ্লীল ব্যাখ্যা শুনিলে শরীর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই সকল ছবির ব্যাখ্যা এইরূপ—"এই দেখ, ভগবান এক সখীর সহিত লীলা করিতেছেন।" লীলা যে কিরূপ জঘন্য, ভাই ভগ্নী, পিতা পুত্র মিলিয়া তাহা দেখিবার যো নাই। যাহারা অল্পবয়স্কা মেয়েদিগকে তীর্থে প্রেরণ করেন, তাহাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ভারতের তীর্থ স্থানের অবারিত মুক্তদ্বার সমূহ যুবতী বিধবাদের প্রতি রুদ্ধ হইলে বুঝি বা ভারতের স্বৈরিণীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইত। ধর্ম্মের নামে তীর্থ স্থান সমূহে অধর্ম্ম, নানারূপ প্রবঞ্চনা বিক্রীত হইতেছে। দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

সেই দুঃখের নিশিতে পাণ্ডাদের নানারূপ কদর্য্য ব্যবহার দেখিতে হইল—এবং ম্লানচিত্তে সহ্য করিতে হইল, কেন না, আর উপায় ছিল না। রাত্রি প্রভাতে আমরা আর একটী লক্‌গেটের তীরে যাইয়া পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধা ছুটিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধা

আসিয়া, অযাচিতরূপে, বৃথা অনেক সাফাই সাক্ষী মানিতে লাগিল। যে সকল কথা বলিল, তার মধ্যে একটী কথা এই, "মেয়েরা তীর্থ দেখিবার জন্য পালাইয়া আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে চুরি করিয়া আনি নাই। ইহার মধ্যে একটী মেয়ে এক বৎসরের একটি কোলের ছেলে রাখিয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি।" এই কথাটী শুনিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। কলিকাতার ঘাটে লোকেরা যে কুলবধূকে অনুসন্ধান করিয়াছিল, বুঝিলাম, সে কুলবধূ ইহাদের মধ্যে একজন। কি সর্ব্বনাশ! কোলের ছেলে ফেলিয়া মা, প্রলোভনে পড়িয়া, এই নর-পশু সম বৃদ্ধার সহিত আসিয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধাকে অনেক তিরস্কার করিলাম। জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া বধূকে সম্বোধন করিয়াও অনেক দুঃখের কথা বলিলাম। তার পর উপরে যে দুটী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, সেখানে আরো দুটী ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ প্রণীত কৃষ্ণদাস পালের একখানি জীবনচরিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া বুঝিলাম। তাঁহাদের নিকট কলিকাতার জাহাজের সেই অনুসন্ধান-সংবাদ এবং এই জাহাদের পূর্ব্ব রজনীর সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, নবাগত ব্যক্তি দুইজন স্কুল সব্ ইনস্পেক্টর, নাম রঘুবাবু ও চন্দ্রবাবু। ইঁহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, ইঁহারা আমাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইহার উপায় করিবেন, আশা দিলেন, এবং নিম্নে আসিলেন। তাঁহাদের সে সহৃদয়তা, সে সদাশয়তা, বাঙ্গালী মেয়েদিগের সতীত্ব-রক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। তাঁহারা নীচের ঘরে আসিয়া পাণ্ডাদের নাম, মেয়েদের নাম, বাড়ীর ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। জাহাজের মধ্যে আমাদের কামরায় যে সকল লোক ছিল, তাহারা ঐ পাণ্ডাদিগের অবৈধ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কোন কোন সহৃদয় পাণ্ডাও সেই তিরস্কারে যোগ দিয়া বলিতে লাগিল "এই নরাধম দুষ্ট পাণ্ডাদিগের অত্যাচারে জগদ্বন্ধুর নাম লোপ পাইতে বসিল, আর কি কেহ আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে?" কিন্তু অন্য কামরার দুই তিন জন পাণ্ডা আসিয়া ঐ দুই পাষণ্ডের সহিত যোগ দিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জাহাজে

খুব গোলমাল উপস্থিত হইল দেখিয়া তীব্র ভর্ৎসনায় তাহারা নিরস্ত হইল। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধা তখন খোসামুদী আরম্ভ করিল। বলিল, "বাবা তোমরা আমার পুত্র। আমাদের সহিত পুরী পর্য্যন্ত চল, তোমরা যা বলিবে, তাই করিব।" মেয়েদিগকে বলিল "তোমরা ইহাদিগকে প্রণাম কর, ইহারা তোমাদের পিতৃতুল্য।" এইরূপ নানা খোসামুদীসূচক কথা বলিতে লাগিল। আমরা বৃদ্ধাকে ও মেয়েদিগকে অনেক প্রকার উপদেশ দিলাম। তখনও আমরা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি না,—কারণ, আমাদের কোনই অধিকার নাই। অতি অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ কটকের ঘাটে পৌঁছিল। যে স্থানে জাহাজ লাগিল, সে স্থানের অতি অপূর্ব্ব শোভা। প্রশস্ত-হৃদয় মহানদীর আবদ্ধ জলরাশি কটকের এই স্থানকে অতুল শোভায় ভূষিত করিয়াছে। নদীর অপর পার্শ্বে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। যাত্রীদের কটক প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তাহাদের জন্য কটকের চারি মাইল দূরে নয়াবাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ওলাউঠার আক্রমণ হইতে কটককে রক্ষা করার জন্যই এই বিধান হইয়াছে। যাত্রীরা সেই দিকেই চলিল, আমরা গম্যস্থানে চলিলাম। কিন্তু মন নানা উদ্বেগে পরিপূর্ণ। রঘুবাবু গাড়ী করিয়া আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। তিনি যেন আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্যই কেন্দ্রাপাড়া গিয়াছিলেন। বিদেশে যাঁহার নিকট যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা চিরকাল মনে থাকে। বাবু রঘুনাথ দাসের সহৃদয়তা ও মধুর ব্যবহার আমরা জীবনে কখনও ভুলিব না। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন।

কটকে বাবু মধুসূদন রাও একজন সদাশয় এবং মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার বাটীতেই আমরা আশ্রয় লইলাম। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়াই সমস্ত পথের কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি তখনই পুলিসের কোন পরিচিত লোকের নিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্তু লোক তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, তিনি যেন কোথায় গিয়াছেন, আরো বলিল যে, কোর্ট ইনস্পেক্টর নারায়ণ বাবুকে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তিনি এই বাবুদিগকে কাছারীতে যাইতে বলিয়াছেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইলে ইহার প্রতিবিধানের উপায় করিবেন। আমরা তখনই কয়েক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কাছারী গমন করিলাম। নারায়ণ বাবুর উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। "পাণ্ডারা দেশের একমাত্র গৌরব স্ত্রীজাতির সতীত্ব লোপ করিল, ব্যাটাদের শাস্তি না দিলেই

নয়,” এইরূপ নানা উত্তেজনা পূর্ণ কথা বলিয়া, তিনি আমাদিগকে লইয়া, আর দুই জন পুলিস ইনস্পেকটরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা অসহায়া মেয়েদের উদ্ধার করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, নারায়ণ বাবু একেবারে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গমন করিলেন। সহৃদয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই বিষয়টী অনুসন্ধান করিতে পুলিসের উপর ভার দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুলিস ইনস্পেক্‌টর, নারায়ণ বাবু ও দুই জন কনষ্টেবলের সহিত আমরা নয়াবাজার অভিমুখে গমন করিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সেই মেয়ের দল পুরী যাইবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে, এবং রন্ধনের আয়োজন করিতেছে। পুলিসের নিকট সকল সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহাদের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। সেই কুলবধূর স্বামীর নাম জানা গেল, কিন্তু বৃদ্ধা নানা মিথ্যা কথা সৃজন করিয়া বলিল যে, জাহাজে যে মেয়েদিগকে লোকেরা অনুসন্ধান করিয়াছে, আমরা তাহারা নই, আমাদিগকে বাড়ীর লোকেরা জাহাজে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার পর পুলিস তাহাদিগকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। কেন এই রূপ অভিভাবক-শূন্য অবস্থায় তোমরা আসিয়াছ, বৃদ্ধা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু আমরা বড় গোলে পড়িলাম; ইহারা সেই মেয়েরা কি না, আমরা নিশ্চয় করিয়া কিরূপে বলিব? সুতরাং পুলিস কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। এ দিকে তাহারা আর এক দিনও অপেক্ষা করিল না, সেই দিনই পুরী যাত্রা করিল। তখনই নারায়ণ বাবুর সহিত একত্রিত হইয়া মধু বাবুর বাড়ী আসিয়া সেই কুলবধূর স্বামীর নিকট, কলিকাতা, বহুবাজার, হাড়কাটা গলিতে টেলিগ্রাম করিলাম। দুই দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের এই রূপ উত্তর পাওয়া গেল যে, “তাহারা পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবেন।” আমরা যখন এই মর্ম্মের টেলিগ্রাম পাইলাম, তখন তাহারা পুরীতে গিয়াছে। টেলিগ্রাম পুলিসকে দেখাইলাম, তাহারা ভিন্ন এলাকার লোক, গ্রেপ্তারের ভার গ্রহণ করিলেন না, আমাদের পরিশ্রম ও চক্ষের জল ফেলাই সার হইল। দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে কুলবধূদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ জীবনে ঘুচিবেনা।

# কটক।

পরবর্ত্তী বর্ণনার সাহায্যার্থ আমরা এস্থলে উড়িষ্যার ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দিলাম।

উড়িষ্যার বর্ত্তমান রাজধানী কটক। উড়িষ্যার ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য ঘটনা পূর্ণ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে যে তিনটী বিভাগ, তন্মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তি, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে উড়িষ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরীর জগন্নাথমন্দিরে অতি প্রাচীন সময় হইতে যে মাদলাপাঞ্জি সুরক্ষিত হইয়াছে, প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ উজ্জ্বলতম স্মৃতি-চিহ্ন ভারতবর্ষে আর আছে কি না, জানি না। খ্রীষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক উড়িষ্যায় রাজদণ্ড পরিচালন করেন। ললিতগিরি, খণ্ডগিরি ও ধউলি পর্ব্বতে অশোক শাসনের ও বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল অক্ষয়কীর্ত্তি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা স্থানে তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। মাদলাপাঞ্জি অনুসারে অশোকের পর ৩১০ খ্রীঃ পুঃ ( B. C. ) হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্নবংশীয় ১০৭ জন রাজা উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, পাঠান, মোগল, ও মহারাষ্ট্র শাসন সংস্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। কেশরী ও গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য হিন্দুকীর্ত্তি ভারতবর্ষে অতি বিরল। ভুবনেশ্বর ও যাজপুর ( যজ্ঞপুর ) কেশরী বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই উভয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইবে। কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভুবনেশ্বর শিব-ধাম এবং যাজপুর পার্ব্বতীধাম। ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশরী বংশ রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ৪০টী পুরুষ লোপ পায়। ৬৩ জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্ব কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া, ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মূর্ত্তি গুলি বৌদ্ধমূর্ত্তির ছায়াতে নির্ম্মিত। এই বংশের রাজত্বের শেষাংশেই কটক সহর রাজধানীতে পরিণত হয়। মকর কেশরী কটকের বিখ্যাত কাঠজুরী বাঁধ নির্ম্মাণ করেন।* এই বংশের রাজা যযাতিকেশরী জগন্নাথ স্থাপন করেন (৪০৯ শকাব্দে)। যে সকল পুরাণে জগ-

---

* Hunter's Orissa, Vol I. Page 653 to 666

নাথ দেবের কথা আছে, সে সমস্তই ইহার পরবর্ত্তী। এই বংশের রাজা ললাটেন্দ্র কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ৫০০খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ক্রমান্বয়ে ৪ পুরুষের ১৫৭বৎসর-ব্যাপী পরিশ্রমে এই মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বংশগত ধর্ম্মানুরাগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই। সপ্তম শতাব্দীতে যাজপুর এই বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই বংশের আদি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

"জনমেজয় দেব মাদলাপাঞ্জির মতে যযাতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। বংশাবলী লেখক যযাতির পিতা চন্দ্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা লিখিয়াছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলী লেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিলেও আমরা তাঁহার বাক্য প্রকারান্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন।

যযাতির তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা জনমেজয় ভুজবলে "যবনদিগকে" জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত চৌদুয়ার নগরে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। সম্বলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয়, রাজা জনমেজয় মগধ রাজদণ্ডের অধীন ছিলেন। দন্ত-কুমার ও হেমমালা বুদ্ধদন্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে পলায়ন করিলে, রক্তবাহু ও তাঁহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, তদন্তে মহারাজাধিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাজবংশজ হওয়াই সম্ভব) এবং তাঁহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবলভ্রষ্ট হইয়াছিল।

জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌদুয়ার ও পুরণের তাম্রশাসনের মর্ম্মালোচনায় অনুমিত হয় যে, জনমেজয়ের তিরোভাব ও যযাতির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও দুই তিন নরপতি উড়িষ্যা শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলই গুপ্ত নরেন্দ্রদিগের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জনমেজয়, কন্দর্প ও যযাতির তাম্রশাসন পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি।

১। শ্রীশিবগুপ্ত দেব।

২। শ্রীমহাভব গুপ্ত — ৩। শ্রীমহাদেব গুপ্ত।

৪। শ্রীমহাশিব গুপ্ত।

১ ও ২ নং নাম জনমেজয়ের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩ নং নাম কন্দর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২ ও ৪ নং নাম যযাতির তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৌদ্বার নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয়, মহাদেব গুপ্তের শাসনকালে, কন্দর্পদেব উড়িষ্যা শাসন করিতেছিলেন।

কন্দর্প দেবের শাসন পত্র পাঠে বোধ হয়, এই সনন্দ জনমেজয়ের সনন্দ দর্শন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। মহাভব গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহাদেব গুপ্ত জনমেজয়ের পুত্রকে রাজ্য প্রদান না করিয়া কন্দর্পকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্দর্প দেবের পর আরও ২।১ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ছিল। কিন্তু মহাভব গুপ্তের পুত্র মহাশিব গুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যযাতিকে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ছিলেন—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যযাতি কেশরী।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে যযাতি জনমেজয়ের পুত্র। তিনি মহারাজাধিরাজ মহাশিব গুপ্তের সমসাময়িক ও দণ্ডাধীন ছিলেন।

মহারাজা যযাতি স্বনামখ্যাত "যযাতিপুর", মতান্তরে "যজ্ঞপুর" (যাজপুর) নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ যযাতি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক যযাতিপুরের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।"

মকরকেশরীর সময় হইতে আমরা কটকের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, সুতরাং কটক যে অতি প্রাচীন সহর, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপর গঙ্গা বংশের সময়েও কটকের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের "অনিয়ঙ্ক ভীমদেব প্রথমতঃ যাজপুর ও চৌদ্বার নগরে বাস করিতেন, পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত বারবাটী নামক স্থানে রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"*

* শ্রীদারুব্রহ্ম ৫৭ পৃষ্ঠা।

গঙ্গাবংশ ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের রাজা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব পুরীর বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। এই বংশের ৮ম রাজা লাঙ্গুলীয় নরসিংহ ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কণারকের অরুণস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৈলাস বাবুর শ্রীদারুব্রহ্ম হইতে উদ্ধৃত হইল।

"কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ তামলুকের রাজগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনন্ত বর্ম্মা সমধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক ইঁহাকে কোলাহল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অনন্ত বর্ম্মা বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মূর্ত্তির সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মহানদী তীরস্থিত দান্দি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই গঙ্গারাঢ়ী বংশে উত্তর কালে অহি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র স্বপ্নেশ্বর ও কন্যা সুরমা দেবী। পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নেশ্বর উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় তিনি কালকবলিত হইলে তাঁহার ভগিনীপতি উৎকলের সিংহাসন অধিকার করেন।

উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চন্দ্রবংশীয় রাজা উড়গঙ্গ * রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীরাজরাজ দেব †, কনিষ্ঠ অনিয়ঙ্কভীম দেব। শ্রীরাজরাজ দেব স্বপ্নেশ্বরের ভগিনী সুরমা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বপ্নেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। সুতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব উৎকল সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ শকাব্দ)। উড়িয়াদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যূনতাহেতু প্রবল প্রতাপ গজপতি, রাজাদিগের চূড়ামণি "অনঙ্গ ভীম" নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু শাসন পত্রে তাঁহার নাম স্পষ্টাক্ষরে "অনিয়ঙ্ক ভীম ক্ষোদিত রহিয়াছে।"

প্রতাপ রুদ্র দেব গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। চৈতন্য দেব ইঁহার রাজত্ব কালে ১২ বৎসর উড়ি-

* বিকৃত নাম চোরগঙ্গ বা চোরংগদেব।

† ইতিহাসে রাজেশ্বর দেব।

ষ্যায় ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্হিত হন। এই রাজত্বের সময়ে তাম্রকূট নগর ( বর্ত্তমান তমলুক ) খুব সমৃদ্ধিশালী সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগর রূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

গঙ্গাবংশের পর পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে ক্রমে ক্রমে কটকসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয় ও হিন্দু দেবদেবীর অনিষ্ট সাধন চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গুলি এই সময় হইতে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। পাঠান রাজত্বের পর মোগল রাজত্বের সময়ে রাজা তোড়লমল্ল ও মানসিংহের দ্বারা যদিও জগন্নাথের সেবার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ভুবনেশ্বর ও যাজপুরের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। মোগল রাজত্বের পর মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। এক হিসাবে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্য হিসাবে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টাদিগের শাসন বিলুপ্ত হয়, এবং উড়িষ্যা ব্রিটীস অধিকারভুক্ত হয়। মারহাট্টারা কটককেই প্রধান রাজধানী করেন। মোগল ও মারহাট্টা রাজত্ব কালেই কটকের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

কটক নগর যাঁহারা বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কাটজুরী নদীর বাঁধ, কেল্লার ভগ্নাবশেষ, জীর্ণ মস্‌জিদ্ সমূহ, সৈন্যাগার প্রভৃতি কটকের প্রাচীনত্ব অতি উজ্জ্বল পরিষ্কার ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছে। কাটজুরীর প্রস্তর-বাঁধ এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। নদীগর্ভ হইতে প্রস্তর রাশি অতি সুকৌশলে ক্রমশঃ স্তূপীকৃত করিয়া, এখন সুদৃঢ়রূপে, মনুষ্যের বুদ্ধি কটক সহরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে যে, বর্ষাকালে মহানদী ও কাটজুরীর প্রবল বন্যাস্রোতে শত শত বৎসর আঘাত করিয়াও ইহার এক খানি প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। এই সুদৃঢ় এবং আশ্চর্য্য কৌশল-নির্ম্মিত প্রস্তর-বাঁধ দ্বারা যদি কটক নগরী সুরক্ষিত না থাকিত, এতদিন কটকের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত! বর্ষা কালে কটকের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে নদীর প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে। কখন কখন কটকের সমভূমি হইতে জলরাশি উর্দ্ধে আরোহণ করে। এই জলরাশিকে এই বাঁধ বুক পাতিয়া বাধা দিয়া সহরকে রক্ষা করে। উড়িষ্যার হিন্দু কীর্ত্তির এই প্রথম লীলা। এই প্রথম লীলা দেখিয়া আমরা বিস্ময়পূর্ণ নয়নে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

মারহাট্টাদিগের সময়ের সৈন্যাগার কটকের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

শ্রেণীবদ্ধ খিলানময় ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃঢ় ও অতি মনোরম সৈন্যাগার দেখিলে ইংরাজদের সৈন্যের ব্যারাক্‌কে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

কটকের তৃতীয় দৃশ্য, কেল্লা। কেল্লার সৌন্দর্য্য ইংরাজেরা একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেল্লা বিলাসের লীলাস্থল বল-ক্রীড়ার ক্ষেত্র রূপে পরিণত। কেল্লার চতুর্দ্দিকে পরিখা, কেল্লার মধ্যের একটী ভজনালয়, এবং ভগ্ন কামানাদি এখনও প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী মৃদু ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছে। কেল্লা—মহানদী নদীর উপরে। নদীর অপর তীর হইতে সৈন্যা-ক্রমণ রক্ষা করিবার এমন সুন্দর স্থান আর নাই। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে, কেল্লার মধ্যস্থিত একটী মৃত্তিকা-স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ভারতের লুপ্ত গৌরব স্মরণ করিলাম। মনে হইল, সে মৃত্তিকা-স্তূপ নয়, যেন প্রাচীন গৌরবময় বংশপরম্পরার অস্থি রাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আহা, সেই সকল গৌরব কোথায়, আর আজ আমরা কোথায়! ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল, আর আজ ইংরাজ-প্রতাপের নিকট অবনত-মস্তক। ক্ষণ-কাল এই সকল কত কি ভাবিলাম। এ দিকে দূরবর্ত্তী পাহাড় শ্রেণীর উপর দিয়া, বিষাদ-মাখা সূর্য্যকিরণ, শেষ রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া, মহানদীকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর মলিনতায় আবৃত করিয়া, এবং আমাদিগের প্রাণকে কি এক নিরানন্দ, কি এক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিল। আমরা ব্যস্ত হইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। ভারতের জন্য যে হিন্দু বংশ শেষ রক্ত দিয়াছিলেন, এবং হিন্দু রাজত্বের যাঁহারা শেষ প্রতাপশালী রাজা, সেই চিরোজ্জ্বল পবিত্র বংশের কোন কৃতী এবং সহৃদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া কয়েক দিন কটকে বড়ই বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের শোণিত এখনও যেন উষ্ণ, এখনও তাঁহাদের প্রাণ ভারত-মমতায় পরিপূর্ণ, এখনও যেন তাঁহারা প্রতি-ভার পূর্ণাবতার, এখনও যেন তাঁহারা আর্য্য-মহিমায় প্রদীপ্ত।—আর আমরা? বংশপরম্পরার আর্য্যমহিমা, আর্য্য প্রতিভা ও গুণরাশি বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া এখন ইংরাজ পদানত কি এক আশ্চর্য্য জীব! কত ভাবিলাম, কত কাঁদিলাম, পৃথিবীর কে তাহার সংবাদ রাখে?

কটকের জৈনমন্দির খুব প্রাচীন না হইলেও একটী সুন্দর দৃশ্য বস্তু বটে। কটকে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে গোপালজীর মন্দির প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ

Imp-4291 Dt-21/10/09

মন্দিরই পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ছায়ায় নির্ম্মিত। কটকের মন্দির সমূহ দেখিলেই উড়িষ্যার হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্যের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা ইংরাজ করকবলে পতিত হয় —মহারাষ্ট্রীয় বিজয় নিশানের স্থানে ব্রিটিস বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়। সেই সময় হইতে কটকের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির সূত্রপাত। কলিকাতা যেমন বাঙ্গালার রাজধানী, কটক সেইরূপ উড়িষ্যার রাজধানী। কটক অতি বিস্তৃত স্থান; কথায় বলে, এখানে বায়ান্ন বাজার, তিপ্পান্ন গলি। বাস্তবিক, কটকের বাজারের সংখ্যা অনেক। বাজার অপেক্ষা গলির সংখ্যা যে আরো অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এত বড় সহরেও ভাল পুকুর নাই। সাধারণতঃ লোকেরা পাতকুয়ার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। কটকের মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত খুব ভাল বলিয়া বোধ হইল না, অনেক রাস্তা এখনও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, পয়নালার বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই। কটকের বায়ু ভাল বলিয়া বহু অধিবাসী স্বত্বেও কটক অস্বাস্থ্যকর হয় নাই। উড়িষ্যা বিভাগের কমিসনারের আফিস, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী, মুন্সেফ কাছারী ও কলেজ গৃহ, এ সমস্তই বর্ত্তমান গৌরবের নিদর্শন। কমিসনারের কাছারী মহানদীর নিকট; ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছারী কলেজের নিকট, কাটজুরী নদীর তীরে সংস্থাপিত। মুন্সেফ ও জজের কাছারী এই উভয় কাছারীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে। কটকের উচ্চশ্রেণীর কলেজ, মেডিকেল স্কুল ভিন্ন আরো ৪।৫ টী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থানীয় উৎসাহী লোকদিগের যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্যারীমোহন একাডেমির নাম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত। ইনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়া এই স্কুলের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন; ইহার জন্য তাঁহার অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে। তিনি অতি সৎলোক ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এখন তিনি স্বর্গে, কিন্তু তাঁহার যত্ন-প্রযুক্ত স্কুলটী এখনও চলিতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অনেক কীর্ত্তি এখানে বিদ্যমান আছে। নানা শ্রেণীর ভজনালয় ও স্কুলাদি ভিন্ন একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। হাজারিবাগে যেমন গবর্ণমেণ্টের একটী রিফরমেটরি আছে, এখানে সেইরূপ একটী অনাথ-নিবাস (Orphanage) আছে। এই অনাথ-নিবাসের গৃহ বহু অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কোন সদাশয় ইংরেজের সৎকীর্ত্তি। কটকে এরূপ সুন্দর অট্টালিকা আর নাই। অনাথ বালক বালিকাদের জন্য খ্রীষ্টসমাজ জগতে যে অপূর্ব্ব কার্য্য করিয়াছেন,

তাহার সমতুল্য কীর্ত্তি আর কোন সমাজে দেখা যায় না। এই অনাথ-বিনাস, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভজনালয় সমূহ, ইংরাজদিগের বসতি, এবং কেল্লার নিকটবর্ত্তী ময়দানের সৈন্য-নিবাস সমূহ দেখিলে কটককে একটী খুব সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, কটক কলিকাতার পর, বাঙ্গালার যে কোন নগরের সহিত সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যে সমকক্ষতা করিতে পারে। কটকে দেখিবার অনেক জিনিস আছে।

আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, বাঙ্গালায় যেমন গবর্ণমেণ্টের রেল-কীর্ত্তি, উড়িষ্যায় সেইরূপ খাল ( Canal ) কীর্ত্তি। উড়িষ্যার নানা বিভাগের খালসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক ইঞ্জিনিয়ার আফিস আছে। উড়িষ্যার খালকীর্ত্তির সমতুল্য কীর্ত্তি ভারতে অতি অল্পই আছে। খালাদি সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল। কটকের উত্তরে মহানদী ও বিরূপার বাঁধ ( Anicut ) দেখিয়া ইংরাজ কৌশল ও বুদ্ধিকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কটকের বর্ত্তমান শোভার প্রধান আকর মহানদী। এই নদীর জলরাশি পূর্ব্বে সাগরে বহিয়া যাইত। বাঁধ দ্বারা এই জলরাশি আবদ্ধ থাকায় কটককে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজকীর্ত্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হইয়াছে। কটক প্রাচীন সময় হইতে শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি যে কোন প্রদেশের অলঙ্কারকে শ্রেষ্ঠতায় পরাজয় করিতে পারে। কিন্তু শুনিলাম, উৎকৃষ্ট শিল্পীদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী।

কটকে প্রেস ও স্থানীয় সংবাদপত্রের অভাব নাই। কটকের প্রিণ্টিং কোম্পানি প্রেসের জন্য একটী সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই বাড়ীর দ্বিতল গৃহটী যেন সহরের সাধারণ সম্পত্তি। এই স্থানে যে কেহ ইচ্ছা করিলে বক্তৃতাদি প্রদান করিতে পারেন। কটকের এই সুন্দর গৃহটী যেন কলিকাতার টাউন হলের ন্যায় ব্যবহৃত। ইহার অধ্যক্ষ বাবু গৌরী-শঙ্কর রায় মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি দুই দিন বক্তৃতার জন্য এই হল আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

কটকের অধীবাসীগণের মধ্যে উড়িষ্যাবাসী, তেলেঙ্গা, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীই প্রধান। ইহার মধ্যে নানা জাতির লোক আছে। তেলেঙ্গা-বসতি দেখিলেই বোধ হয় যেন মান্দ্রাজের অতি নিকটে আসিয়াছি।

দীর্ঘ ও কৃষ্ণকায়, বলবান, সাহসী তেলেঙ্গা স্ত্রী পুরুষদিগকে দেখিলে মনে অনেক পূর্ব্বের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ইহারাই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বিজয়ের ইংরাজের প্রধান অস্ত্র। এখনও তেলেঙ্গাজাতির বহু লোক ইংরাজ-সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত। কটক তেলেঙ্গা সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত। নিজের শোণিত নিজেরা পান করিতে ভারতবাসী যেমন মজবুত, পৃথিবীর আর কেহ তেমন আছে কিনা, জানি না। ভারতবাসীর ন্যায় স্বদেশদ্রোহী বুঝি বা বিধাতার সৃষ্টিতে আর নাই। উড়িষ্যাভ্রমণে যাইয়া সমুদ্র-চর তেলেঙ্গা-দিগের সাহসের প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু এমন মূর্খ এবং অজ্ঞান জাতি আর ভারতে আছে কি না, কে জানে! তবে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহেব-সহবাসে থাকিয়া ইহারা বাহিরের সভ্যতা যথেষ্ট শিখিয়াছে।

কটকের বাঙ্গালী শ্রেণী আমাদের দেশের গৌরব বিশেষ। অতিশয় দূরবর্ত্তী, বান্ধব-বিহীন প্রদেশে যাইয়া ইঁহাদের সহৃদয়তা ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতি নগরে, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, স্কুল বা কলেজের শিক্ষক প্রভৃতিই উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে গণ্য। অনেক নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ অহঙ্কারী, অত্যাচারী, রূঢ়ভাষী, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত এবং ধর্ম্মহীন। বলিতে সঙ্কোচ এবং লজ্জা হয় যে, বাঙ্গালার বড় বড় সহর গুলি মদ বেশ্যার স্রোতে যেন সদা ভাসমান এবং আমাদের দেশের আশা ভরসা যাঁহারা, সেই শিক্ষিতাভিমানী, উচ্চ শ্রেণীর উকীল ও হাকিমেরা সেই কলঙ্ক স্রোতে উল্লসিত চিত্তে নিমগ্ন। অনেক স্থানের এইরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু উড়িষ্যার রাজধানী, পুরী, কটক, বালেশ্বর ও উড়িষ্যার সংলগ্ন নাগপুরের রাজধানী রাঁচি ও হাজারিবাগ পরিদর্শন করিয়া তত্তৎ স্থানের অধিকাংশ বাঙ্গালীর নির্ম্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। কটকের বাঙ্গালী উকীলগণের মধ্যে বাবু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিবল্লভ বসু, বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের বিশুদ্ধ নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। হরিবল্লভ বাবু কটকের প্রধান উকীল, কিন্তু ইঁহার ব্যবহার ও চরিত্র অতি চমৎকার। বাবু নরেন্দ্র নাথ সরকার কটকের মধ্যে ঋষিতুল্য চরিত্রের

অধিকারী। কটকের বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অতি সৎলোক। কটকের মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ অতি মধুর প্রকৃতির লোক। দূরদেশে যাইয়া আমরা এরূপ সহৃদয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি। মতিবাবু কটকের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অমায়িকতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বত্র পূজিত। এরূপ লোক বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একজন ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি। ইঁহার সহিত অল্প কথোপকথনেও আমরা সুখী হইয়াছি। এই সকল মহাত্মাদিগের দ্বারাই কটকে বাঙ্গালীর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎকল-বাসীদিগের মধ্যে বাবু নন্দকিশোর দাস, বাবু মধুসূদন দাস মহাশয়গণ আদর্শ ব্যক্তি। ইঁহারাই উড়িষ্যাবাসীর প্রতিভা, উচ্চ শিক্ষা এবং চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। এমন লোক নাই, যাঁহারা ইঁহাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়াছেন।

উড়িষ্যাতে বহুকাল হইতে অনেক বাঙ্গালীর চিরকালের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে বাস করিতেছেন। কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিলাম, এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র হইবে। উড়িষ্যা এই বাঙ্গালীদিগের নিকট সভ্যতা ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রভূত রূপে ঋণী, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কটকের বাবু রাধানাথ রায়, বাবু জগমোহন রায়, বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত। রাধানাথ বাবু বর্ত্তমান সময়ে উড়িষ্যার প্রধান কবি, ইনি স্কুল সমূহের জয়েণ্ট ইনস্পেকটর। দীন বাবু কোন সরকারী কাজ করেন না। জগমোহন বাবু পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই তিন জন লোকের নিকটই আমরা বিশেষ রূপ ঋণী। দীন বাবু উড়িষ্যার মঙ্গলের জন্য যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই মহাত্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের কটক পরিদর্শনের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইনি কুলি-অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এই কার্য্যে বাবু ললিত মোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রধান সহায়। রাধানাথ বাবু উড়িষ্যার মধ্যে একজন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের সংস্পর্শে, তাঁহার মধুর ব্যবহারে, তাঁহার অভিজ্ঞতার ছায়ায় থাকিয়া আমরা জীবনোন্নতি এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, রাধানাথ বাবুর মত লোক উড়িষ্যায় অতি অল্প আছেন।

জগমোহন বাবু বৃদ্ধ, কিন্তু উৎসাহের জীবন্ত অবতার। এমন সৎকাজ নাই, যাহাতে তাঁহার সহানুভূতি নাই। বেশ্যাদিগের পালিত মেয়েদিগকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, বর্ত্তমান সময়ে এই সাধু চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত। ইনি কটক ব্রাহ্ম-সমাজের আদি বিভাগের একমাত্র আদর্শ সভ্য। কিন্তু ইঁহার প্রাণ এখন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। কয়েক দিন ইঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি।

কটকের ব্রাহ্ম-সমাজে ও ছাত্র-সমাজে অনেক চরিত্রবান লোক আছেন। কতিপয় অধ্যাপকের যত্নে নীতি শিক্ষার জন্য একটী হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোপালজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মের জন্য যিনি যাহা করেন, তিনিই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। কটকের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মধুসূদন রাও মারহাট্টাবংশের গৌরব বিশেষ। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন চরিত্রবান ব্যক্তি। যে সকল মহাত্মার পুণ্যপ্রভায় ব্রাহ্ম-সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমরা ইঁহার বাসাতেই আশ্রয় পাইয়াছিলাম। মধু বাবুর ন্যায় সজ্জন ব্যক্তির মধুর ব্যবহার জীবনে ভুলিবার যো নাই। ইনি একজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। উড়িয়া ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী; ইনিও একজন উড়িয়া ভাষার উৎকৃষ্ট কবি।

কটকের কলঙ্কের কথা এই যে, জজ ও মুন্সেফ কাছারি প্রভৃতির অতি নিকটে ও সহরের অতি সুন্দর প্রকাশ্য স্থানে, সদর রাস্তার উপরে, বেশ্যালয় অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। শুনিলাম, উড়িষ্যার অনেক রাজা রাজড়ার ধন প্রাণ এই স্থানে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। কটকের এই কলঙ্ক দূর করিতে কটকের সম্ভ্রান্ত লোকেরা চেষ্টা করিলে যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, আমরা মনে করি না। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি অতি কম।

কটকের আর একটী কলঙ্ক এই দেখিলাম, ভদ্র পল্লীতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে বেশ্যার নাচ হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের চিত্ত কলুষিত হয়, রুচি অপবিত্র হয়। বাঙ্গালায় বড় লোকের বৈঠকখানায় খেম্‌টা নাচ প্রভৃতি যে কদর্য্য লীলার অভিনয় দেখা যায়, কটকের রাস্তার ধারে সে চিত্র দেখিলাম। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা অপেক্ষা কটককে একটু কলুষিত বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক, কটকের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে।

## ভুবনেশ্বর।

এইবার আমরা উড়িষ্যার অতুল কীর্ত্তিময় স্থানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আমাদের লেখনী কম্পিত হইতেছে, হৃদয় সঙ্কুচিত হইতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তিকাহিনী যথাযথ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব না, কিন্তু অন্যকে বলিতে বা বুঝাইতে পারিব, সে আশা নাই। তবে এ চেষ্টা কেন? বিড়ম্বনা মাত্র।

উড়িষ্যা যাত্রার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইবার আরম্ভ হইল। জাহাজের পালা শেষ হইয়াছে, এই বার গরুর গাড়ীর পালা আরম্ভ হইল। কটক প্রিণ্টিং কোম্পানির হলে "যুগধর্ম্ম" বিষয়ে দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শেষ করিয়া ক্লান্ত কলেবরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শ্রদ্ধেয় জগমোহন বাবু বক্তৃতার গৃহ হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মনে কিছুই উদয় হয় নাই। বাসায় যাইয়াই, কাহার আদেশে কে জানে, আমাদের বন্ধু জগমোহন বাবু মধু বাবুকে এই রূপ এক খানি পত্র লিখেন—"আমাদের বন্ধুরা পুরী যাত্রা করিবেন, সঙ্গে কুইনাইন, সাগু, স্পিরিট ক্যাম্ফর ও ক্লোরোডাইন দেওয়া উচিত।" জগমোহন বাবুর এই রূপ সহৃদয় ব্যবহারে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানান হইল, কিন্তু ঔষধাদির বিশেষ কোন চেষ্টা হইল না; তিনি অগত্যা এক শিশি ক্লোরোডাইন ও এক শিশি স্পিরিটক্যাম্ফর সঙ্গে দিলেন। এই সময়ে বুঝিলাম না, সঙ্গে ঔষধ পথ্য না লইয়া আমরা কি বিষম ত্রুটি করিলাম। উষ্ণ রক্তে, নির্ভাবনায়, আহারান্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ খানিকে গো-শকটে তুলিলাম। বন্ধুগণ বিদায় দিলেন; মধু বাবু সঙ্গে একটী বন্ধুকে পাঠাইলেন। এক গাড়ীতে আমরা তিনজন। আমি, আমার বন্ধু ও পরিদর্শক-বন্ধু। এতদ্ভিন্ন গাড়োয়ান। গরু বেচারাদের সাধ্য কত, একবার বুঝুন। কটকের দক্ষিণে কাঠজুরী নদী। এই নদীর অর্দ্ধ মাইল-ব্যাপী বালুময় বক্ষ শকট হইতে নামিয়া পদব্রজে যাইতে হয়। আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, মৃতবৎ গাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম। বন্ধুদ্বয় অতি কষ্টে সেই দ্বিপ্রহর অন্ধকারময় রজনীতে কতকটা জলময় ও কতকটা জলশূন্য বালুরাশি

অতিক্রম করিলেন। নদী বক্ষ অতিক্রম করিয়া বন্ধুগণ গাড়ীতে উঠিলেন। ধীরে ধীরে, ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে, পুরীর রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিল। কিয়ৎদূর যাইয়া শুনিলাম, দূরবর্ত্তী কোন গাড়ীতে চুরি হইয়া গেল। এরূপ বিপদ সে নির্জ্জন পথে প্রায়ই ঘটে।

গাড়ীতে অতি কষ্টে তিন জন পড়িয়া রহিলাম। আমার সঙ্গের বন্ধু রাত্রে বলিলেন, বড় শীত। আমি বড় ক্লান্ত, কথাটায় বড় কাণ দিলাম না। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে বন্ধুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, বন্ধুর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের গাড়ী বালি-হস্তা চটী পার হইয়া পুরীর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া ভুবনেশ্বরের রাস্তা ধরিয়াছে। প্রবাদ এই, এই বালিহস্তায় রামচন্দ্র বালি রাজাকে বধ করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা বিধাতা জানেন, আমরা বালিহস্তা পার হইয়া আবার বালিময় জলশূন্য নদীবক্ষ দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলাম। এ নদীও কাঠজুরীর একটী শাখা বিশেষ; বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়, কিন্তু এখন শুষ্ক। এই বালুময় নদী পার হইবার সময় দলে দলে ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিন্দুসাগরে স্নান করাইব, ভুবনেশ্বর দেখাইব, ইত্যাদি নানা প্রলোভনযুক্ত কথা বলিতে লাগিল। নিবাস কোথা, তোমাদের পাণ্ডা কে?—ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন তাহারা করিতে লাগিল। উত্তর না দিলে ছাড়ে না, কেই বা এত পাণ্ডার এত কথার উত্তর দেয়? দিতেই বা কে পারে? তাতে আবার আমাদের একজন বন্ধু পীড়িত। বালুময় নদী পার হইতে গরু দুটী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এই অবস্থায় গাড়োয়ানের প্রহার; এদিকে সূর্য্য আরক্ত লোচনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মস্তকের উপরে তীব্রবেগে ধাবিত হইয়াছেন, বন্ধুর শরীর দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে, আর এদিকে এই পাণ্ডাদের উৎপাত। বড়ই বিরক্ত হইলাম। পীড়িত বন্ধু কোন পাণ্ডা-শিশুকে ভীষণ বিভীষিকা দেখাইলে, সে পলায়ন করিল। ক্রমে ভুবনেশ্বর নিকটবর্ত্তী হইল। জ্বরের ঔষধ নাই, পথ্য নাই—দেখার সাধ মিটিয়াছে, এখন কি করি, কোথায় যাই, কেন পূর্ব্ব রজনীতে জগমোহন বাবুর পরামর্শ শুনি নাই, এই সকল বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা ১০ টার সময় সেই প্রাচীন অদ্ভুত কীর্ত্তিময় স্থানে পৌছিলাম। সেখানেও পথ্য মিলিল না, ঔষধ

মিলিল না, আমাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। শেষে অগত্যা একটু "কন্দক" দিয়া পীড়িত বন্ধুকে জল খাওয়াইলাম, এবং অতি সংক্ষেপে ভুবনেশ্বরের মহা কীর্ত্তি সকল দেখিলাম। দিবসে অন্নাহার হইল না। সামান্যরূপ জলযোগ করিয়া দিন কাটাইলাম। কিন্তু তাহাতে একটুও কষ্ট হইল না। ভুবনেশ্বরের কীর্ত্তি এমনই মনমুগ্ধকর।

মহারাজ যযাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই জগন্নাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। যযাতি কেশরী তাঁহার জীবনের এই শেষ কীর্ত্তি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৭ বৎসর পর মহারাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয়। ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণে বিলুপ্ত হয়, চতুর্থ পুরুষ সমাধা করেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের ন্যায় বড় শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় মন্দির সমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ভুবনেশ্বর, কেশরী বংশের সময়, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, এক সময়ে একটী কম কোটী শিব-মন্দির ভুবনেশ্বরের পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা হণ্টার সাহেব ৭০০০ সাত সহস্র মন্দির গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেশরী বংশ উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু এ সময়েও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকোপ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মন্দির সমূহের গাত্রে যে সকল ছবি বিদ্যমান আছে, তাহা বৌদ্ধ মূর্ত্তির ছায়ায় অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গাত্রেও অশ্লীল ছবি আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ হইবে। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল এত ঊর্দ্ধে কিরূপে উত্থিত হইল, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, প্রায় ৪ মাইল দূর হইতে সোপান নির্ম্মাণ করিয়া এই সকল প্রস্তর উত্তোলন করা হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে তদনীন্তনের শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়; এমন একখানি প্রস্তর দেখিলাম না, যাহাতে আশ্চর্য্য কারুকার্য্য বা কোনরূপ ছবি অঙ্কিত নাই। এই মন্দিরের দুই পার্শ্ব ও পশ্চাতে তিন দিকে পার্ব্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিকের তিনটী অপূর্ব্ব বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি অতি বিরল। পার্ব্বতীর অঙ্গের বস্ত্র খানিতে এত উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে যে, অন্য কোন

সৃষ্ট বস্তুতে সেরূপ শিল্পনৈপুণ্য সম্ভবে না। অতি ক্ষুদ্রং অংশের অবয়ব পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ বিকাশ করা হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত ষাঁড় রহিয়াছে; এরূপ আশ্চর্য্য পাষাণ-নির্ম্মিত ষাঁড় আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্ব, অপরূপ শোভা দেখিয়া ও ভাবিয়া অবাক্ হই-লাম। কেশরী বংশ ধর্ম্মের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। ভুবনেশ্বরের এক মাইলের মধ্যে কোন রূপ বড় পাহাড় নাই। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড সকল বহুদূর হইতে আনীত হইয়া থাকিবে। কত অর্থ যে এই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, কল্পনা করা যায় না। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের লোকেরা যে কি না করিয়াছে, জানি না। ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের নিকটে যে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এস্থলে সংক্ষেপে সে সকল সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিলে চলে না। অধিকাংশ মন্দির অরণ্যে বেষ্টিত হইয়াছে, অনেক মন্দির ধূলিসাৎ হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, প্রস্তর রাশিকে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার মসল্লা প্রয়োগ করা হয় নাই। সহস্রাধিক বৎসরের প্রবল পরাক্রমও এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যে কোন কোন মূর্ত্তি অঙ্গহীন হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকগুলি মন্দির এখনও সমভাবেই আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির এমন সুন্দররূপে আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত যে, দুর্জ্জয় কালকে পরাজয় করিয়া এতদিন একই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, একখানি প্রস্তরও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় যে, কখনও ইহা ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবে না। এরূপ কীর্ত্তি পৃথিবীতে আর কতটী আছে, জানি না।

যে কথা বলিতেছিলাম। অন্যান্য যে কোন মন্দিরের প্রতি তাকাও না কেন, তাহা দেখিয়াই মোহিত হইবে। সামান্য সামান্য যে সকল মন্দির দেখিলাম, তার সমতুল্য মন্দির বাঙ্গালায় একটীও দেখি নাই। অসংখ্য মন্দিরের অসংখ্য নাম। প্রতি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ নাম গণিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, শেষে পরাস্ত হইলাম। সহস্র সহস্র নাম স্মরণ রাখা বা লিপিবদ্ধ করা, উভয়ই অসম্ভব।

মন্দির সকলের মধ্যে কেদার গৌরীর মন্দির সম্বন্ধে কিছু বিশেষত্ব আছে। কেদারকুণ্ডের জল পরিষ্কার, কোন ঝরণা বহিয়া আসিতেছে; স্থানটী বড়ই নির্জ্জন, অনেক প্রাচীন বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। ইহার নিকটে আর একটী কুণ্ড আছে। জনশ্রুতি, অশোক অষ্টমীর দিন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এই কুণ্ডের জল পান করিলে সন্তান-সম্ভবা হয়। এই জন্য অশোক অষ্টমীর দিন এই কুণ্ডের জল বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সময়ে এই স্থানে একটী মেলা হয়। কেদার গৌরী সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে। কেদার এক জন রাজপুত্র, গৌরী এক রাজ কন্যা। বাল্যকালে ইহারা একত্রে আহার বিহার করিতেন। বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে মধুর ভালবাসা ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সেই ভালবাসা রূপান্তর ধারণ করিল। অর্থাৎ বাল্য ক্রীড়া হইতে উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিল। কিন্তু কৌলিক প্রথায় বিবাহে বাধা জন্মে। সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত হন। গৌরী অগ্রে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলে গমন করেন। তাঁহাকে ব্যাঘ্র তাড়না করে। ভয়ে তিনি কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রক্তাক্ত বস্ত্র কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কেদার অরণ্যে আসিয়া গৌরীকে না দেখিয়া এবং রক্তময় বস্ত্র দেখিয়া মনে করেন যে, গৌরী ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইয়া থাকিবেন। তিনি হতাশ প্রণয়ে আত্মহত্যা করেন। গৌরী আসিয়া কেদারের মৃত দেহ দেখিয়া শোকে অধীর হন, এবং তিনিও আত্মহত্যা করেন। ক্রমে যখন রাজধানীর লোকের অনুসন্ধানে উভয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল, তখন প্রণয়ী যুগলের স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হইল। কেদার গৌরীর প্রেম অক্ষয় করিবার জন্য উভয়ের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দুটি সম্মুখবর্ত্তী মন্দিরে স্থাপন করা হইল। এই গল্প সত্য, কি মিথ্যা, জানি না, কিন্তু দেখিলাম, কেদার ও গৌরীর মূর্ত্তি আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত। এইস্থানে প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম। কেদারকুণ্ডের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হইলাম ও এই নির্জ্জন স্থানে অনেক সময় কাটাইলাম। কত কথা যুগপৎ মনে উঠিতে লাগিল। কেদার গৌরীর স্বর্গীয় প্রেম কাহিনী আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। ভাবিলাম, কোথায় কেশরী বংশ, কোথায় উড়িষ্যার রাজধানী, কোথায় প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মভাব, কোথায় প্রেম, কোথায় পুণ্য, কোথায় পবিত্রতা! হৃদয়ে কত স্বপ্ন জাগিল, কত কথা উঠিল, ভাবিয়া ভাবিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলাম। ইচ্ছা ছিল,

সমস্ত দিন কেদারকুণ্ডের তটে বসিয়া কাটাই, কিন্তু শকটে পীড়িত বন্ধুকে বৃক্ষ-ছায়ায় রাখিয়া গিয়াছি—আর থাকিতে পারিলাম না। আর কি করিব, ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেম-কীর্ত্তি সেই কেদার-গৌরীর শ্মশানে, শ্রদ্ধার সহিত, কয়েক বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া শূন্য প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম।

ভুবনেশ্বরের আর কি পরিচয় দিবার আছে? বিন্দু-সাগর সম্বন্ধে একটী কথা। সহস্রাধিক বৎসর বক্ষের উপর দিয়া বহিতে দিয়া অম্লান চিত্তে বিন্দু-সাগর একটী মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—আজও কত জনকে আপন শীতল পূত বারিতে স্নান করাইয়া দেব দর্শনে পাঠাইতেছে।

ভুবনেশ্বর শিবধাম, সুতরাং এখানে শক্তির কোন চিহ্ন নাই। শুনিলাম, বৈতাল-মন্দিরে কিছু শক্তি-চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা দর্শন করি নাই। যাজপুর পার্ব্বতীধাম, ভুবনেশ্বর শিবধাম, কণারক সূর্য্যধাম, পুরী বিষ্ণুধাম, মহাবিনায়ক পর্ব্বত গণেশধাম, এই কয়টী উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ। ভুবনেশ্বরে প্রায় ৩০০ ঘর পাণ্ডা আছে। এখানে একটী সামান্য স্কুল ও একটী সামান্য পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের যত্নে আমরা বিনা খরচে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে সমর্থ হইলাম, এবং রাত্রে প্রসাদ পাইলাম। সেই পাণ্ডার দৌরাত্ম্যময় স্থানে, বন্ধু বান্ধবহীন মহাশ্মশানে, এই সদাশয় লোকটীকে যেন মরুভূমির ওয়েসিসের ন্যায় বোধ হইল। এই দিন খণ্ডগিরি ও কপিলেশ্বর দর্শন করিয়া রাত্রে ভুবনেশ্বরের পোষ্টাফিসে অবস্থান করিলাম। পীড়িত বন্ধুর পথ্যের জন্য আর কিছুই পাওয়া গেল না,—রাত্রে কয়েকটী মুরকী খাওয়ান গেল এবং কয়েকটী হরিতকী রাত্রে বাটিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্নে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা খণ্ডগিরি বর্ণন কালে লিপিবদ্ধ করিব। ভুবনেশ্বরের কাহিনী এই পর্য্যন্ত শেষ।

---

## খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

অপরাহ্নে আমরা খণ্ডগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পীড়িত বন্ধুকে গাড়ীতে রাখিয়া আমি সেই পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ ধরিয়া ভুবনেশ্বরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখিয়া লইলাম। ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর একটী অক্ষয়কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। বিন্দুসাগরের তীরে ইহা সংস্থাপিত; ইহার

মধ্যে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ সেন রাজগণ নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"সাবর্ণ গোত্রীয় "ভবদেব ভট্ট বালবল্লভী ভুজঙ্গ" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা দেশস্থ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বিন্দুসরোবর তীরে অনন্ত বাসুদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।"

ভুবনেশ্বরের সমস্ত দ্রষ্টব্য মন্দির গুলি দেখা হইলে একটী দ্বিতল গৃহের উপর উঠিয়া ভুবনেশ্বরের একটা জীবন্ত ছবি চিরকালের জন্য প্রাণে আঁকিয়া লইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ তখন অল্প অল্প মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল ; মন্দির রাশির উপরে, দূরের প্রান্তরে, আরো দূরের পাহাড়-শিখরে সেই রশ্মি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, সব যেন অনন্তকালস্থায়ী কীর্ত্তি রাশিতে পরিপূর্ণ। এই স্থান হইতে খণ্ড-গিরির দৃশ্য অতি মনোহর—যেন আকাশের গায়ে দুই খণ্ড নীল-মেঘ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, আর সেই মেঘের সহিত অস্তিম সূর্য্য প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলী করিয়া কোন্ অদৃশ্য জগতে প্রয়াণের জন্য বিদায় লইতেছে। খণ্ডগিরি গমনোদ্যত সূর্য্যের বিচ্ছেদে অধীর ও চঞ্চল হইয়া আপন বক্ষে, বৃক্ষের শিরে সেই রশ্মি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু সূর্য্য ঐ যায়, ঐ যায়, ঐ ডুবে, মেঘের আড়ালে, কি জানি কেন, ঐ লুকায় !! কাজেই খণ্ডগিরির শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধে কে যেন মলিন বিষাদের ছায়া, গাঢ় আঁধার, সচঞ্চল কুয়াসা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লেপিয়া দিতেছে। পশ্চিম দিকে এই শোভা, পূর্ব্ব দিকে, অনেক দূরে ক্ষীণরশ্মির কোলে কপিলেশ্বরের মন্দির আকাশে মস্তক তুলিয়া কি যেন মৃদু কথা মৃদু ভাষায় ঐ রশ্মির কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে। কতবার সূর্য্য উঠিয়াছে, এইরূপে কতবার ডুবিয়াছে—কত বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই প্রাচীন কীর্ত্তিসাগর তবুও যেন সূর্য্যের জন্য লালায়িত। ক্ষণকাল ভাবিলাম, যে কীর্ত্তিসাগর অনন্ত আঁধারের কোলে চির-নিমগ্ন, তার আবার রূপ দেখাইতে এত সাধ কেন ? যে জাতি পরপদে মস্তক বিক্রয় করিয়া অন্যের কীর্ত্তিতে ভূষিত

হইতে আজ উল্লসিত, সে জাতি কি এই কীর্ত্তি দেখিয়া জাগিবে? যে জাতি চিরতরে পরের বেশ শরীরে পরিয়া, পরের ভাষা কণ্ঠে ভরিয়া সাহ্লাদে, সাহঙ্কারে মানবপদবীতে উত্থান করিতে প্রয়াসী হইয়া আঁধারসাগর গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, সেই জাতি কি সোণার ভারতের এই সোণার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিবে? যে দেশের নৃপতিবর্গ সাহেব-নৃত্য, সাহেব-ভোজ, ফিরিঙ্গি-সেবার জন্য অকাতরে অম্লানচিত্তে অর্থরাশি কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, সেই দেশের নৃপতিগণের অহঙ্কারের স্থানে লজ্জা বা ধিক্কার জন্মিবে না, নিশ্চয়! তবে আর কেন? ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, তোমরা কেন আর আলোকের জন্য লালায়িত হইতেছ? যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর ফিরিবে না। এখন সূর্য্য প্রতারক বেশ ধরিয়া ভারতে কেবল আঁধার লেপিয়া ফিরিতেছে, মায়া ছাড়িয়া এখন ক্ষণকাল আঁধারের সেবা করিতে থাক। অতি দুঃখে, মনে মনে পাগলের ন্যায় এইরূপ কত কথা বলিতে বলিতে ভুবনেশ্বরকে অন্ধকারে ডুবিতে দিয়া, আমরা সেই গজেন্দ্রগামী শকটে আরোহণ করিয়া খণ্ডগিরির দিকে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির মধ্যবর্ত্তী স্থান যেন মরুভূমির ন্যায়—পাহাড়ও নয়, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রান্তরও নয়—না-মাঠ-না-পাহাড়, অথবা পাহাড়ও, মাঠও। সূর্য্যটা প্রাতে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিল, এ বেলা কিছু ক্ষীণ, কিন্তু তবুও সেই রূপ বা ততোধিক জ্বালাতন করিতে লাগিল। একে অনাহার, তাহাতে আবার বন্ধুর জ্বর, তাতে এখন এক গাড়ীতে পাঁচজন! বন্ধুর গা দিয়া এই সময়ে যেন আগুন বাহির হইতেছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা বন্ধু জ্বর গায়েই দেখিয়াছিলেন—খণ্ডগিরির একটা ছবি প্রাণে আঁকিয়া লইবেন, এখন এই ইচ্ছা। নিষেধ স্বত্বেও তাই তিনিও চলিয়াছেন। কিন্তু জ্বর আজ খুব্ সময় বুঝিয়াছে,—যে আপন পরাক্রম দেখাইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না। গাড়ী জনপ্রাণীর বসবাস-শূন্য মরু সদৃশ সেই না-মাঠ-না-পাহাড়ের মধ্য দিয়া, সূর্য্যের তীব্র ক্ষীণ রশ্মি ভেদ করিয়া, উদরে আগুন কণা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিল। বন্ধু তখন জ্বরে ছটফট করিতেছিলেন, আমার প্রাণ তখন ভাবে বিভোর। আমি গুণ গুণ করিয়া গান রচনা করিয়া পাগলের ন্যায় গাইতেছিলাম—

"দেখা দেও নাথ, রক্ষা কর নাথ, তুমি বিনে আর কেবা আছে?
আমি তোমাবিনে কিছু জানি না হে।

( বিপদকালে ) ও নাথ তুমি বিনে আর গতি নাই হে।" ইত্যাদি। বন্ধু অধীর হইয়া এই সময়ে আমাকে বলিলেন, "ভাই, মা তোমার কথা খুব্ শুনেন, আমার জন্য প্রার্থনা করিতেছ না ?" আমি বলিলাম, "করিতেছি, কোন ভয় নাই।" মায়ের কাছে সজলনেত্রে প্রাণ ভরিয়া নীরব ভাষায় অনেক কথা বলিলাম। এ দিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ী খণ্ডগিরির পাদমূলে, ডাকবাঙ্গালার নিকটে উপস্থিত হইল। রাস্তার ধারেই একটী যোগীর আশ্রম। আশ্রমের গৃহের দেয়ালে নানারূপ ছবি আঁকা। যোগী বলিলেন, বুদ্ধদেবের খড়ম এখানে আছে, দেখিয়া যাও। আমরা সে খড়ম দেখিলাম না, যোগীর কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল না। এদিকে ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইতেছে; সুতরাং খণ্ডগিরির অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য তৎপর হইলাম। পীড়িত বন্ধুকে হাত ধরিয়া পাহাড়ের কতকদূর তুলিয়া, দুই চারিটী গুহা দেখাইয়া, আবার গাড়ীতে রাখিয়া আমরা তিনজন পাহাড়ে উঠিলাম। গাড়োয়ান ও পীড়িত বন্ধু গাড়ীতে রহিলেন।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দুটী সংলগ্ন ছোট পাহাড়। দুটীকে খণ্ডগিরির নামেই সাধারণত লোকেরা পরিচয় দেয়, এখান হইতে খোর্দ্দা সব ডিবিসন পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। খণ্ডগিরিতে যেরূপ বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। হণ্টার সাহেব বলেন, খণ্ডগিরিতে প্রায় ১৮২টী ছোট বড় গুহা বিদ্যমান আছে। পাণ্ডারা বলে, ২০০ গুহা আছে। বোম্বে এলিফেণ্টায় যে সকল প্রাচীন গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গুহা সকল তাহা হইতেও প্রাচীন। ৫৩৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। ২৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজত্ব। এই সময়ে খণ্ডগিরির গুহা সকল খোদিত হয়। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশের রাজত্ব আরম্ভ। সুতরাং ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরির কত পরে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। খণ্ডগিরিতে যে অসংখ্য গুহা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে, অনন্ত-গুহা, ব্যাঘ্র-গুহা, হস্তি-গুহা, রাণী হংসপুরই প্রধান। অনন্ত গুহা ৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ১৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত খোদিত। ব্যাঘ্র গুহা ৩০০ খ্রী পূর্ব্বাব্দে খোদিত। অনন্ত গুহা একটী প্রকাণ্ড ফণাধারী সর্প-মূর্ত্তি; হস্তিগুহা হস্তির আকৃতি, ব্যাঘ্র-গুহা ব্যাঘ্রাকৃতি। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, হস্তিগুহার উপরে অস্পষ্ট ভাষায় অনেক কথা লিখিত আছে। ঐরা রাজার সময়ে অনেক গুহা খোদিত হইয়াছিল। হস্তিগুহাটী খুব প্রকাণ্ড, কিন্তু স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

শুনিলাম, ইংরাজ-কুলাঙ্গারেরা আপন খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বন্দুকের আওয়াজে অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গুহাগুলি প্রায়ই অপরিস্কার হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পথিকেরা রন্ধন করিয়া খাইয়াছে। এমন অতুল কীর্ত্তির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল।

খণ্ডগিরির গুহা সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাণী-হংসপুর গুহা। এটী প্রকৃত প্রস্তাবে গুহা নহে; প্রকাণ্ড দ্বিতল চক মিলান বাড়ীবিশেষ। চারিটী ঘর ১৪ ফিট লম্বা, ৭ ফিট পার্শ্ব, দেয়াল ৩—২ ফিট চওড়া। বারাণ্ডা ৬০ ফিট লম্বা, ৭ ফিট চওড়া। বারাণ্ডার একদিকে দেওয়াল, একদিকে প্রস্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। এই সমস্ত বাড়ীটী পাহাড়ে খোদিত। দেয়ালের গাত্রে অসংখ্য ছবি বিদ্যমান, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, কোথাও বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে, ইত্যাদি অনেক অপরূপ খোদিত ছবি বিদ্যমান। ছবিগুলি ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছে বলিয়া হণ্টার সাহেব অনুমান করেন। ছবিগুলি যে কিছু আধুনিক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাণীহংসপুরের গুহা গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছা সেখানে বাস করা যায়। রাণীহংসপুর ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত। খণ্ডগিরির হস্তিগুহার গায়ে যে অনুশাসন খোদিত হইয়াছিল, তাহা বড় অস্পষ্ট হইয়াগিয়াছে। রাণীহংসপুরের প্রতিকৃতির ধারে কোথাও কোথাও অনেক কথা লিখিত আছে। প্রবাদ এইরূপ শুনিলাম, ঐরা রাজার সময়ে রাণীহংসপুর খোদিত হয়। রাজা যখন সপরিবারে খণ্ডগিরিতে আগমন করিতেন, তখন এই রাণীহংসপুরে বাস করিতেন। খণ্ডগিরি হইতে ধউলি পর্ব্বত পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। ধউলি পর্ব্বত খণ্ডগিরি হইতে ৫ মাইলের কম ব্যবধান হইবে না, খণ্ডগিরিতে এই সুরঙ্গের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও ধউলি পর্ব্বতের উপরে এই সুরঙ্গের স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে দেখিয়াছি। খণ্ডগিরি দুই খণ্ডে বিভক্ত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একখণ্ডে এই সকল গুহারাজি বিদ্যমান, অপর খণ্ডের বিশেষ পরিচয় কয়েকটি প্রাচীন কুণ্ডে পাওয়া যায়। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, আকাশ গঙ্গা বা গুপ্তগঙ্গা—এগুলি অতি আশ্চর্য্য, এই সকল কুণ্ড পাহাড়ের উপরে সংস্থাপিত। আমরা ফাল্গুন মাসে গিয়াছিলাম, তখনও জল রহিয়াছে দেখিলাম। এখানে অনেকে তীর্থ করিতে আসেন। পাহাড়ের এই খণ্ডের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটি জৈনমন্দির ও তৎ-নিম্নে একটি জৈন-অতিথিশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জৈন

মন্দিরটী প্রায় ৫০০ বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে, শুনিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট এত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। জৈন-মন্দিরে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির সকলের ন্যায় চরণযুগল রহিয়াছে দেখিলাম; কিন্তু এখানে এখন আর পূজা হয় না। মন্দির ও অতিথিশালা একেবারে শূন্য—এখন চর্ম্মচটিকার আবাসে পরিণত। জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পশ্চিমের দৃশ্য ক্ষণ কাল দেখিলাম। পাহাড়ের এই খণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের পর প্রান্তর ধুধু করিতেছে—গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িল না। সূর্য্য তখন আমাদিগকেও এই অতুল কীর্ত্তিরাজিকে আঁধারে ডুবাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশে নিষ্কলঙ্ক দ্বিতীয়ার চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিয়া আমাদিগকে একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা ক্ষণকাল অতিথি-শালায় বিশ্রাম করিয়া খণ্ডগিরির নিকট বিদায় লইলাম। এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, তার বিনিময়ে, দুঃখীর সম্বল কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই জনপ্রাণীশূন্য পাহাড়ে ফেলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কোথায় সেই বৌদ্ধ-যোগীগণ, কোথায় সেই প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন, কোথায় অশোক, কোথায় বা বুদ্ধ—ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভারতে এক সময়ে যদি এত জমাট ধর্ম্মভাব ছিল, সাধকদিগের প্রতি রাজণ্যবর্গের এত অনুগ্রহ ছিল, তবে সে অনুগ্রহ আজ কোথায়? হায় ধর্ম্মের স্থানে এখন ব্যভিচারের পরাক্রম, যোগতপস্যার স্থানে এখন পেচকের নৃত্য, নিষ্কাম ব্রতের স্থলে এখন বাহ্য-চটক, গৌরব-লালসা বা আস্ফালন! আমরা কতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, পাহাড় হইতে নামিবার সময় একবার ভাবিলাম। এক সময়ে দারজ্জিলিং, শিলং ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে ইংরাজের রাস্তা-নির্ম্মাণের ও রেল-চালানের কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, আর আজ প্রাচীন সময়ের এই প্রস্তর-নির্ম্মিত কীর্ত্তি দেখিয়া ইংরাজকে শত শত ধিক্কার দিলাম। যখন ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়ও হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা কিরূপে এই অখণ্ড অভ্রভেদী পাহাড় খণ্ড সকলে এই সকল গুহা নির্ম্মাণ করিল, ভাবিয়া বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলাম। সেই সকল অস্ত্র কোথায়, যাঁহা দ্বারা এই কঠিন প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল? সেই সকল শিল্পীই বা কোথায় যাঁহাদের হস্ত এই চিরস্থায়ী দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস পাহাড়ের গায়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে? এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারে না—কেহই উত্তর দিল না। ভগ্নপ্রাণে খণ্ডগিরি

হইতে অবতরণ করিলাম। কত প্রস্তর খণ্ড উল্লঙ্ঘন করিলাম, কিন্তু একবারও পদস্খলন হইল না। পাহাড়ের ছায়ায়, বৃক্ষের ছায়ায়, ক্ষুদ্র অপ্রশস্থ পথ স্থানে স্থানে অলক্ষ্য ও অদৃশ্য হইয়াছিল, তবুও পড়িলাম না, তবুও মরিলাম না। বাঙ্গালীর শোণিত এই অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে প্রোথিত হইলে, পাছে এ সকলে কলঙ্ক স্পর্শে, তাই এমন ঘটনা ঘটিল না। মানুষ হইলাম ত বাঙ্গালী হইলাম কেন? মানুষ হইলাম ত ভারতে জন্মিলাম কেন? মানুষ নামধারী হইলাম ত মনুষ্যত্ব পাইলাম না কেন, ধর্ম্ম ও চরিত্রে বঞ্চিত রহিলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে শূন্য প্রাণে গাড়ীতে আসিলাম, আসিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। বন্ধুর পথ্য অনুসন্ধানের জন্য কপিলেশ্বর যাইতে হইবে, এজন্য আর বিলম্ব করা হইল না। গাড়ীতে আসিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম—তখন বাক্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ভাবের স্রোত প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই রূপ অবস্থায় রাত্রি ৯ টার সময় গাড়ী ভুবনেশ্বরের ডাক ঘরের সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

---

## কপিলেশ্বর ও ধউলি পর্ব্বত।

পুনঃ ভুবনেশ্বর—পুনঃ সেই পুণ্যতীর্থ, কীর্ত্তির উজ্জ্বল ক্ষেত্রে আসিয়া আবার নববল পাইলাম। নববলে বলীয়ান হইয়া সেই রাত্রেই কপিলেশ্বর দেখিতে চলিলাম। কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল ব্যবধান। কপিলেশ্বর মন্দির ভুবনেশ্বরের অনুকরণে নির্ম্মিত, কিন্তু এ মন্দির অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক।

পুরীর ন্যায় ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ এক বৎসরের নির্ম্মিত রথে বহুবর্ষ চলে, পুরী বা ভুবনেশ্বরের রথে সেরূপ চলে না। এই উভয় স্থানে প্রতি বৎসর নূতন জিনিসে নূতন রথ প্রস্তুত হয়। সে গগনস্পর্শী রথ সামান্য ব্যাপার নহে, তাহাতে প্রতি বৎসরে বহু অর্থ, বহু পরিশ্রম ব্যয় হইয়া থাকে। পুরীর রথযাত্রা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—এক মহাকাণ্ড। পুরীর রথের ন্যায় বড় রথ বাঙ্গালায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভুবনেশ্বরের রথেও খুব ধুমধাম হয়, কিন্তু পুরীর রথযাত্রার সহিত তাহার তুলনা হয় না। এক সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে ভুবনে-

শ্বরই উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ ছিল, কিন্তু কাল সহকারে শৈবধর্ম্মের প্রকোপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়—পুরী অথবা বিষ্ণু-ধাম, উড়িষ্যার এবং বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, ভারতের মধ্যে প্রধান তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের কীর্ত্তি এখন বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে। শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, এখন আর এখানে পূর্ব্বের ন্যায় যাত্রী সমাগম হয় না বলিয়া পাণ্ডাদের দিনপাতেও দারুণ কষ্ট হইতেছে। সামান্য দুটী একটী পয়সার জন্য তাহাদের কত কাকুতি মিনতি, কত অত্যাচার, কত অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন! ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কপিলেশ্বর মন্দির সংস্থাপিত। কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কপিলেশ্বর আধুনিক মন্দির, তত জাঁকজমক নাই। মন্দিরটী ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট। উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহ একই ছাঁচে, একই ভাবে নির্ম্মিত। সাধারণতঃ মন্দির গুলি চারি অংশে বিভক্ত। শ্রীমন্দির বা পীঠস্থান, জগমোহন বা দর্শক মণ্ডলীর স্থান, নাটমন্দির বা নৃত্যাদির মন্দির এবং ভোগমন্দির বা ভোগ-উৎসর্গের ভবন। প্রধান মন্দির গুলির প্রাঙ্গণ খুব বিস্তৃত, সহস্র সহস্র দর্শক সমাগমেও স্থানের অকুলান হয় না। উড়িষ্যার মন্দির সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিব। সকল মন্দিরেরই বহিঃপ্রাঙ্গণ প্রস্তরময়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের পর প্রাচীর। মন্দির সমূহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় জুতা সিংহদ্বারে রাখিয়া যাইতে হয়। কপিলেশ্বরে দুই শতের অধিক ঘর পাণ্ডা বসতি করেন। পাণ্ডাদের বসতি দেখিবার উপযুক্ত বটে। কামাখ্যার পাণ্ডাদের বসতি অপেক্ষা এখানকার বসতি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘর। সকল ঘর শ্রেণীবদ্ধ, এক ঘর অন্য ঘরের সহিত সংযুক্ত। উড়িষ্যার অনেক পল্লিতে আমরা এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ বসতি দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ গিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া সব যাইতে পারে, দুই পার্শ্বে সারি সারি ঘর। রাস্তার এক সীমায় তুলসী মণ্ডপ, ও পাড়ার দেবালয় বা সঙ্কীর্ত্তনের গৃহ। তুলসি মণ্ডপ প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি দুঃখী, অতি দরিদ্র যে, সেও তুলসি-মণ্ডপ নির্ম্মাণে কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছে। কপিলেশ্বরের নিকটেই ভার্গবী নদী। মহানদী হইতে কৈয়াকই নদী বাহির

হইয়াছে। কৈয়াকই আবার দয়া ও ভার্গবীতে বিভক্ত হইয়া চিল্কা হ্রদে পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদী ধউলি পর্ব্বতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কপিলেশ্বরে বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত কিছুই নাই, কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের ছায়ায় নির্ম্মিত—অথবা ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ মাত্র; সবই আছে—অথচ ভুবনেশ্বরের সহিত কিছুরই তুলনা চলে না। কপিলেশ্বরের মন্দিরের ধারেই একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। ভুবনেশ্বর এবং কপিলেশ্বর, উভয় স্থানে বহু দোকানাদি আছে। দোকানের মধ্যে পান-সুপারীর দোকান সর্ব্বত্রই জাঁকাল। শুনিয়াছি, উড়িষ্যায় পূর্ব্বে বারুই ছিল না, বঙ্গ প্রদেশ হইতে বারুই যাইয়া পানের চাষ করে। এখন পান-চর্ব্বণের জন্য উড়িষ্যা বিখ্যাত; অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও প্রতিদিন এক পয়সার পানের কম চলে না। উড়িষ্যাবাসী ধনী দরিদ্র সকলের হাতেই তাম্বুলের থলিয়া থাকে। কপিলেশ্বরের দোকান সমূহ অনুসন্ধান করিয়া নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পুরীষময় কিছু সাগুদানা পীড়িত বন্ধুর জন্য সংগ্রহ করিয়া লইলাম। সংক্ষেপে কপিলেশ্বর দেখিয়া রাত্রেই ভুবনেশ্বর ফিরিলাম। ভুবনেশ্বরে এক দিন ছিলাম বটে, কিন্তু তেমন দিন জীবনে অতি অল্পই জুটিয়াছে। ভুবনেশ্বর আমার প্রাণে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

শেষ রাত্রে আবার গাড়ী চলিল। ধউলি পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথ নাই, কোথাও নদীগর্ভ, কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র, কোথাও বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। সে যে কি কষ্ট, যাঁহারা কখনও গরুর গাড়ীতে এজন্মে ভ্রমণ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। প্রাতে আমাদের গাড়ী ধউলি গ্রামের নিকট পৌছিল। আমাদের সঙ্গের পথপ্রদর্শক বন্ধু উত্তরাশাসনে পর্ব্বত প্রদর্শন করিবার জন্য এক জন শিক্ষককে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে আমরা সেই অপরিচিত ক্ষেত্রে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উঠিল। বেলা দুই দণ্ডের সময় এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে পরিদর্শক বন্ধু উপস্থিত হইলেন। পীড়িত বন্ধুকে লইয়া পুরীর রাস্তার দিকে গাড়ী চালাইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিয়া আমরা ধউলি পর্ব্বতের দিকে প্রফুল্ল চিত্তে চলিলাম। আমরা পর্ব্বতের পশ্চিম সীমা ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের পশ্চিম পাদপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে সিদ্ধিদাতা

গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, আর আমরা পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই সুরঙ্গের নিকট পৌঁছিলাম। দেখিলাম, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুই তিন জন লোক পাশাপাশী হইয়া অনায়াসে এই সুড়ঙ্গ দিয়া গমন করিতে পারে। ক্রমে নিম্ন হইয়া, সেই অখণ্ড প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ খণ্ডগিরির দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে ভুবনেশ্বরের গগনস্পর্শী মন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। খণ্ডগিরিও দেখা যায়, কিন্তু কিছু অস্পষ্ট। শুনিলাম, খণ্ডগিরি ৫ মাইলের কিছু অধিক ব্যবধান হইবে। সুড়ঙ্গ দেখিয়া অবশেষে ধউলি পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ধউলি পর্ব্বতের পূর্ব্বে কৌশল্যাগাঙ্গ। কৌশল্যাগাঙ্গ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য জনশ্রুতি উড়িষ্যায় প্রচারিত আছে। শুনিলাম, এই পুকুরটীর দীর্ঘ ৩ মাইলের উপর হইবে এবং প্রস্থ এক মাইলের কিঞ্চিদধিক হইবে। কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি!

এখন দীঘিটীর অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা শস্য উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্ত্তী কতক স্থানে যে জল আছে, তাহাতে মনোহর পদ্মবন শোভা পাইতেছে। এই পুকুর সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, কন্যা সহবাসে কোন রাজার একটী সন্তান জন্মে। এঁকথাটী অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশ হইলে, রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন। অবশেষে রাজার প্রতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা হইল, সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কন্যা যতদূর গমন করিতে পারিবে, ততদূর ব্যাপিয়া একটী পুকুর কাটিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই ঘটনা হইতে ইহার উৎপত্তি। উপযুক্ত পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস শুনিয়া পশুসম মানব-রিপুকে শত ধিক্কার দিলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস কটকেই শুনিয়াছিলাম, ধউলি পর্ব্বতের উপরে সেই সুড়ঙ্গ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরাশাসনের সেই শিক্ষকের নিকট পুনঃ সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের পশ্চিমে ধউলি পর্ব্বত, তার পশ্চিমে নদী, উত্তরতটে উত্তরাশাসন গ্রাম, পূর্ব্বে পূর্ব্বশাসন গ্রাম, তৎপর পুরীর রাস্তা, দক্ষিণে দক্ষিণাশাসন। কৌশল্যাগাঙ্গ খননের 'পর সেই রাজকুলাঙ্গার নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার তটত্রয়ে বহু ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জঘন্য পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখিয়া অবশ্য একটু সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ের চরিত্রহীনতার কথা ভাবিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। এমন কোন্ পাপ' আছে, যার জন্য হিন্দু-সমাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যে সকল কার্য্যের জন্য লোকেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, সচরাচর শুনি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পাপকার্য্য নয়। মদ্যপান, ব্যভিচার—সতীত্ব নাশ—এ সকল পাপ করিলে এখন আর সমাজে দণ্ড নাই, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না! পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ কোন্ স্বর্গ হইতে কোন্ নরকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ক্ষণকাল ভাবিলাম এবং সূর্য্যের তীব্র ভর্ৎসনায় বিরক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশোকের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে শঙ্করেশ্বর নামক ক্ষুদ্র মন্দিরটী দেখিয়া লইলাম, কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হইল না। অশ্বত্থামা এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সে বিরাটমূর্ত্তি পর্ব্বতের গাত্রে খোদিত, কিন্তু এখন কিছু ভগ্নদশাগ্রস্ত। তাহার নিম্নেই পবিত্র ভাষায় অবিনশ্বর অক্ষরে পর্ব্বতের গাত্রে অশোকের ত্রয়োদশটি অনুশাসন লিখিত রহিয়াছে, অক্ষর গুলি পর্ব্বতের অতি সুন্দর স্থানে খোদিত হইয়াছে—বেশ পরিষ্কার রহিয়াছে, একটুও অস্পষ্ট হয় নাই—কখনও যে হইবে, তাহাও বোধ হইল না। হণ্টার সাহেব বলেন, অশোক রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ধউলি অনুশাসন (Dauli inscriptions) খোদিত, অর্থাৎ ২৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। শুনিলাম, সেই অনুশাসনে অশোকের ত্রয়োদশটী ধর্ম্মোপদেশ লিখিত রহিয়াছে। অশোক-শাসন দেখিয়া মনের মধ্যে কত কথা জাগিল; কিন্তু সে কথা বলিতে আর ইচ্ছা নাই। অশোক অনুশাসন দর্শন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন পবিত্র হইল। সেই প্রাচীন স্মৃতিময় কাহিনীর সংস্পর্শে ক্ষণকাল থাকিয়া যেন নবজীবন পাইলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা তখন ভুলিয়া গিয়াছি—সংসার-মমতা তখন বিস্মৃত হইয়াছি। জীবনের সে দিন আর কি কখনও পাইব!!

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিল, ত্রস্ত হইয়া কৌশল্যাগাঙ্গের শুষ্ক পূত গর্ভ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া পুরীর রাস্তার দিকে গাড়ী ধরিতে ছুটিলাম। চতুর্দ্দিকের সেই প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ দৃশ্যরাজি যেন স্বপ্নের ন্যায় চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে লাগিল। মস্তিষ্ক চিন্তায় এবং শরীর ঘর্ম্মে অবসন্ন—এই অবস্থায় পুরীর প্রশস্ত এবং অতি সুন্দর রাস্তায় উঠিলাম। গাড়ী আরও কিছু দূরে ছিল। আরও কিছু হাঁটিতে হইল। গাড়ীতে উঠিবার সময় পীড়িত বন্ধুর পথ্য, সেই পূর্ব্ব রজনীর অতি কষ্টে সংগৃহীত

সাগু, সঙ্গের পরিদর্শক-বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে ভুল হইল। সেই বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। উত্তপ্ত রাস্তার উত্তপ্ত ধূলিরাশি উড়াইয়া গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। কোথায় যাইব, কি খাইব, পীড়িত বন্ধুর পথ্য কোথায় পাইব, ভাবিয়া কিছুই ঠিক পাইলাম না। বিধাতার কৃপা-ভাণ্ডারে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে?

## পুরীর রাস্তা ও পিপ্‌পলী চটী।

সেই উত্তপ্ত ধূলিময় রাস্তা দিয়া, ফাল্গুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় করিয়া গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্ব্বদিনের অর্দ্ধাহার বা অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ—এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়া-রই কথা। এক গাড়ীতে দুই জন, একজন পীড়িত—গাড়ীর পার্শ্ব ১৷৷, ১৮ হাত বই নয়—তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে আগুনকণা চতুর্দ্দিকে, তায় ধূলিরাশি গাড়ীর চতুর্দ্দিকে সদাই উড়িতেছে—কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্তু এই বিষম কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম। পুরীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্ত্তি-স্তম্ভ। শুনিলাম, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আসামের ট্রঙ্ক রোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগড়রের নীচ দিয়া ভারতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত ট্রঙ্ক রোড (Great trunk road) গিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। শুনিলাম, জনৈক ইংরাজ-ভ্রমণকারী এই রাস্তাটীকে ভারতের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাস্তা নিম্ন ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হইতে কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রাস্তাটী বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল নৌকায় পার হইতে হয়, তদ্ভিন্ন ছোট ছোট নদীর উপর বিস্তর প্রস্তর-নির্ম্মিত পুল বিদ্যমান। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটী অপেক্ষাকৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু সে নদী শীতকালে জল-শূন্য, শুধু বালুময়, গরুর গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকায়

গাড়ী পার হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের প্রত্যেক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ-বাহাদুর যে সকল স্মারক-লিপি অন্তর্হিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতেছেন। পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নির্ম্মিত। পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম। সে প্রস্তর অপেক্ষাকৃত কোমল, ঈষৎ লালবর্ণ, যেন না-মাটী-না-পাথর। পুরীর রাস্তায় যত যাত্রীর ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন রাস্তায় হয় কি না, সন্দেহ। অসংখ্য লোক, অসংখ্য মালের গাড়ী, যাত্রীর গাড়ী অনবরতই চলিতেছে। দোল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সময়ে রাস্তায় লোক ঠেলিয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই প্রকাণ্ড রাস্তার স্থানে স্থানে যাত্রী-নিবাস বা চটী আছে। চটীতে খড়ের ঘর, পাতকুয়া, কোথাও দুই একটী পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিদ্যমান আছে। ইংরাজ-বাহাদুর অনেক চটীতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য পায়খানা প্রস্তুত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক মাঠে, পাশাপাশী হইয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিত। চাঁদবালীতে এরূপ দৃশ্য এখনও দেখা যায়—আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চাঁদবালী ভদ্রকের অধীন; এইটী জাহাজ হইতে অবতরণের স্থান—এখানে পায়খানার বন্দোবস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একদিকে পুরুষ ও একদিক স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট,—ঠিক যেন রেলওয়ে-ষ্টেসনের বন্দোবস্ত। বড় বড় চটীতে বড় বড় পায়খানা। কিন্তু এই পায়খানার ধারেই—স্থানে স্থানে অসংখ্য নর কঙ্কাল দেখা যায়। পুরীর পথে যখন বসন্ত বা ওলাউঠার ধূম পড়ে, তখন সৎকার করিবার লোক থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অৰ্দ্ধমৃত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলায়ন করে। সে অতি ভীষণ দৃশ্য। আমরা স্থানে স্থানে এই রূপ রাশি রাশি নর-কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অশ্রুপাত করিয়াছি, এবং ভাবিয়াছি, যে তীর্থের জন্য এত আয়োজন—সেই তীর্থের পথে চিকিৎসালয়ের কোন বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদের দেশের দানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পথে ঔষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। কত ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন

না ; এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই। এখন দুই একটী স্থানে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয় প্রস্তত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প এবং তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য যে, মানুষ-সাগরের উপর দিয়া যখন প্রবল পরাক্রমে মহামারির ঢেউ চলে, তখন কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারে না। যা'ক্। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার শোভা দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল। গাড়ী চলিতে চলিতে বেলা আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় পিপ্‌লীতে পৌছিল। পিপ্‌লী একটী প্রকাণ্ড চটী, এখানে দাতব্য-চিকিৎসালয়, ডাকঘর, থানা, রেজেষ্ট্রারের আফিস, পুকুর, বাগান ও বহু দোকান পসারী আছে। এটী যেন একটী ছোট সহরের মত। মধ্যদিয়া পুরীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, দুই ধারে সারি ২ অসংখ্য ঘরবাড়ী। পুরীর সকল চটীতেই বাজার আছে, কিন্তু এখানকার বাজারটী কিছু বড়। বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ, কাষ্ঠ, এবং সর্ব্বস্থানেই প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। পিপ্‌লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। পথে ভাবিতে-ছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্‌লীতে পৌছিয়াই দেখি, গাড়ীর নিকট গরম দুগ্ধ লইয়া দুই তিনটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাজির। এ এক অপরূপ ব্যাপার। পুরী হইতে ফিরিবার সময় এই স্থানে কত চেষ্টা করিয়াছি, দুধ পাই নাই। কিন্তু আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগের জন্য যেন এই মহা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ! দেখিয়া অবাক্ হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল। বিধাতার এই অযাচিত দান, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বন্ধুকে কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান করিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বুঝি বা সেই কপিলেশ্বরের সাগু আনা ঘটে নাই। কতক ক্ষণ পর দেখিলাম, সেখানে মৎস্যও উপস্থিত। বন্ধুকে কতক সুস্থ করিয়া স্নান করিলাম এবং গাড়োয়ান ভায়ার যত্নে কিছু অন্নাহার করিলাম। এই পিপ্‌লীতে বন্ধুর কয়েকবার দাস্ত হইল। তাহাতেই যেন দারুণ জ্বর পলায়ন করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যহীন নর-কঙ্কালপূর্ণ সেই রাস্তায়, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুর আরো অনেকবার জ্বর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন বারই এত অল্পে ছাড়ে নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম। দেহের ও মনের ক্লান্তি এই পিপ্‌লী চটীর বাজারে ফেলিয়া বেলা ৫ টার সময় আবার

গাড়ীতে উঠিলাম। পিপ্‌লী চটী বহুদূর বিস্তৃত—অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত পিপ্‌লীর সজ্জিত গৃহরাজি পরিশোভিত। পিপ্‌লীতে অনেক নারিকেল গাছ আছে, দেখিলাম। এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরম্ভ। পুরী জেলায় নারিকেল গাছের যেরূপ আম্‌দানী, উড়িষ্যায় আর কোথাও তেমন নাই। পুরী জেলা সমুদ্রের তীরে স্থাপিত, সুতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বুঝি নারিকেলের কিছু অধিক স্ফূর্ত্তি। পুরীর রাস্তা দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। পথে স্থানে স্থানে দস্যুর ভয়, কিন্তু গাড়ীতে যে বিপদ, দস্যুর ভয় করিবার অবসর ছিল না—সে বিষয় ভাবিবারও সময় ছিল না। গাড়ী ক্রমাগত চলিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আর একটী চটীতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। গরুর আহার খড় ও কুড়া (কুণ্ডা) অথবা চূর্ণীকৃত তূষ। এই কুড়া সকল চটীতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে তাহারা মহাহ্লাদে তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাগে না, অথচ গরু খুব সবল ও সুস্থ থাকে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আট ঘটিকার সময় রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাড়িল। বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, আমরা পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যাত্রীগণের আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া মোহিত হইলাম, আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনকে শত শত বার ধিক্কার দিলাম। জগন্নাথের মন্দির দেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে—এই আশায় তাহারা সকল কষ্ট ভুলিয়া তীরবেগে রুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে, কেহ মস্তকে মলিন বস্ত্রে রৌদ্রের তেজ নিবারণ করিতেছে—পথকষ্টে শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহাদের মুখ প্রসন্ন। এমন পুণ্যময় দৃশ্য দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। আমরা জীবনে আর কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। জীবন যেন এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল। ক্রমে জগন্নাথ-মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান গগনে বাহু তুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া যেন যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়া ডাকিতেছে। যখন মন্দিরের নিশান ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চতুর্দ্দিক হইতে মহা কল্লোলে "জয় জগন্নাথ" শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার, সে যে কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমরা যাত্রীগণের মূর্ত্তিতে ধর্ম্মজীবনের অনন্ত তত্ত্ব পাঠ করিতে করিতে, সেই শ্রেষ্ঠতীর্থাভিমুখে অগ্রসর

হইলাম। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাণ্ডাদের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী বেলা ৯ টার সময় আঠার-নালার নিকট পৌছিল। লোকে বলে এবং হণ্টার সাহেবের পুস্তকে লেখা আঠার; কিন্তু ছুটী রাখাল বালকের কথানুসারে গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্ত্তে ১৯টী খিলান আছে। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, মনে হয় না।

## পুরীর বাহ্যিক অবস্থা।

এক মতে, আঠার নালা (যাহাতে ১৯টী খিলান বিদ্যমান) মহারাষ্ট্রীয়-দের পূর্ব্বে, (১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মৎস্যকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিল্কা অভিমুখে গিয়াছে। আঠার নালা পুরীর সিংহদ্বার। এই খানে উপস্থিত হইলে সাধকের জীবন সার্থক হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত উদিত হয়, অধার্ম্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুরীর কথা আজীবন ভাবা যায়, কিন্তু লেখা যায় অতি অল্প।

পুরীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর রাস্তা। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিল্কা হ্রদ ২৮ মাইল এবং কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। এই বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম্ম-ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবিতে পরিপূর্ণ। ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, ধউলি প্রভৃতি সমস্ত এই ক্ষেত্রের মধ্যে। ছুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্ম্মের পবিত্র লীলাভূমি হইয়াছে। এই ছুই সহস্র বৎসর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। এই ছুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায় যাঁহারা ভারতের গৌরব বলি-লেও অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, রামানন্দ, জয়দেব, কবির, সকলেই এই ভূমি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এমন পূত ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে?

উড়িষ্যা সৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরী

বংশ, গঙ্গাবংশ, সূর্য্যবংশ, ভুঁইবংশ, যাঁহারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শৈব ধর্ম্মের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু ধর্ম্মে পরিণত হয়। গঙ্গাবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুমন্দির বা পুরীর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা পরে বিবৃত করিব। ১১০৭—১১৪৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষ। উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেন না, তাহা সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না।

পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীনিবাসের সংখ্যা ৫০০০। ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৬০ মঠ আছে। মঠের ইতিহাস এইরূপ। পূর্ব্বে যে সকল সাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য তদানীন্তনের রাজন্যবর্গ বিপুল বিষয় সম্পত্তি দান করিতেন। মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয় দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, সাধারণতঃ নাম মাত্র ধর্ম্ম চর্চ্চা ও অতিথি-সৎকার করেন। এই সকল বৃত্তিধারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। হণ্টার সাহেব বলেন, মঠ সমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ পাউণ্ড। মহারাষ্ট্রীয়দের সময়ে পুরীর মন্দিরে যাত্রীদের নিকট হইতে টেক্স আদায় হইত। এক পাউণ্ড ৯ সিলিং করিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইংরাজেরা তাহা রহিত করেন।* ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। পুরীর দেবোত্তরের আয়, হণ্টারের মতে, ১০১০০০ পাউণ্ড হইবে। পুরীতে প্রতিবৎসর ৫০০০০ হইতে ৩০০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্যু সংখ্যা বৎসর ১০০০০ হইতে ৫০০০০। ৩০০০ পাণ্ডা যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর নানা দেশে গমন করিয়া থাকে।

ইংরাজ শাসনে পুরী একটী জেলায় পরিণত হইয়াছে; খোর্দ্দা ইহার এক মাত্র সবডিবিসন। পুরীতে গবর্ণমেণ্টের কাছারী, জেলখানা, ডাক্তার-

* Calcutta review, Vol. X, p 218

খানা, গবর্ণমেণ্ট স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্তই আছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গালা, সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে সংস্থাপিত। পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬০। ৭০ ফিট পর্য্যন্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যায়। কথিত আছে, নীলাচলে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ নীলাচল বালুময় অচল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। পুরীর পথ ঘাট সব সৈকতময়। কাছারীর চতুর্দ্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি—তরঙ্গায়িত মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ; বায়ুর প্রকোপে মেঘ যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি তেমনই। যে রাস্তা দিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত পথ। এই রাস্তাটী প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে। এত বড় প্রশস্ত পথ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরেও নাই

পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃশ্য বস্তু—সাগর। প্রধান কাজ-সেই অসহায়া রমণী চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান। ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টা-ফিসের সম্মুখে, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় ১১ টা বাজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাসা বালিকা-বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে, সমুদ্রের অতি নিকটে। এত নিকটে, বোধ হইত যে, সমুদ্রের গভীরগর্জ্জন নিস্তব্ধ রজনীতে যেন আমাদের শিয়রে জাগিয়া অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে। পীড়িত বন্ধুকে বিজয় বাবুর বাসায় রাখিয়া আমি একটু স্ফূর্ত্তি পাইলাম। পূর্ব্বে জানিতাম, বিজয় বাবু আড়ম্বরশূন্য লোক ; তাঁহার ভালবাসা মুখে ভাসিয়া বেড়ায় না—তাহা হৃদয়ের গভীরতম স্তরের মধ্যে লুক্কায়িত। কিন্তু বিজয় বাবু আমা-দিগকে পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর আনন্দ বাহিরে প্রকাশ পাইবার নয়, কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দূরদেশে, বহুকাল পরে বন্ধুর সম্মিলন, অপূর্ব্ব সম্মিলন। আহারান্তে বিজয় বাবু ও আমি সাগর তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ন ২টা বাজিয়াছে। সূর্য্যের তীব্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ ; অনন্ত-প্রবাহিত মুক্ত বায়ু সূর্য্যের অতি প্রখর তেজকেও মন্দীভূত করিয়াছে। সাগরের ঠিক ধারে একটী টালিময় রাস্তা কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুদ্রকে আমাদের দেশের রাস্তার পাথর-কুচি বা খোলা মন্থন করিতে পাবে না।

সেই টালি দ্বারা নির্ম্মিত রাস্তার ধারে, সাগরের ২০।৩০ হাত অনতিদূরে মধ্যে মধ্যে বসিবার জন্য বেঞ্চ আছে। আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম। সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম, সে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে, প্রবল বায়ু-প্রবাহ বৃক্ষের পত্রগুলিকে যেন কাঁচি-ছাটা করিয়া দিয়াছে। সাগর তীর,—বন্ধুর মিলন—জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ছুটিয়া যাই। কত দূর হইতে বায়ু আসিতেছে, কত দূর হইতে সেই পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে, কেহ জানে না। পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত যাও,—কেবল অনন্ত বারি রাশি—পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত শুধুই জলরাশি। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত নীলসাগর—আকাশে ও জলে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে; কোথায় আকাশের শেষ, কোথায় জলের শেষ, ঠিক বুঝা যায় না। দূর হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের ঢেউ আকাশে চড়িয়া মেঘের আকার ধরিতেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আকাশে ধায়। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সমুদ্র হইতে সকলের জন্ম। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নদী নালা দিয়া সাগরে মিশিতেছে। এ এক দৃশ্য। কিন্তু এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোফা-লুফি করিতেছে, এক অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোন কোন তরঙ্গ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া শেষে আমাদের পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে। এত বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন? এত উচ্ছ্বাসই বা কেন? শুনিয়াছি, সাগর ৫॥ মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্ব্বত ৬ মাইলের অধিক উচ্চ নাই। এত জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সময় সমস্ত তট প্লাবিত করিয়া দেশ ডুবাইয়া যায়? কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়; কেন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতের আজও আবির্ভাব হয় নাই। কেবল কল্পনা ও 'থিওরি' লইয়া যাহাদের বিদ্যার চরম দৌড়, কি আস্পর্দ্ধা, তাহারা অনন্তের সীমা গণিতে ধায়!

পুরীর সাগর এ জগতে অতুল শোভার ভাণ্ডার। জগতে অনেক সাগর আছে, কিন্তু পুরীর সাগরের ন্যায় বুঝিবা আর কোথাও সাগর এমন মিষ্ট নয়,

এমন মধুর নয়। মান্দ্রাজে ঝড় হয়, সুন্দরবন বন্যা-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, কিন্তু বহুকাল যাঁহারা পুরীতে আছেন, তাঁহারাও এখানে ঝড় বন্যার প্রবল প্রকোপ দেখেন নাই। শুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাগর-জলে প্লাবিত হইয়াছিল। পুরীর সাগরের শোভা অতুল। এই জন্যই বুঝি, কণারকের সূর্য্য মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরও বুঝি বা এই জন্যই। অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুবিলাম। সসীমে অসীম—সীমায় অসীমা মিলিয়া পুরীতে যে অপূর্ব্ব জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত মহান্ যেন প্রতিভাত হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপনা হারাইলাম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয়া আপমার বোধ হয় পীড়া হইয়াছে। বন্ধু বুঝিলেন না, আমি কি হইয়া গিয়াছি! বসিয়া, বসিয়া, বসিয়া—দিন কাটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দিন কাটিল, সূর্য্যও ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল। জীবনে অন্ততঃ এক দিন—এই দিন, আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছি। আমার ন্যায় কেহ অনন্ত-পিপাসু থাক, ঐ পুরীর সাগর তীরে এক বার অন্বেষণ করিয়া এসো।

## পুরীর শ্রীমন্দির।

সন্ধ্যার সময়, বিজয় বাবু, পুরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সম্ভ্রান্ত উকীল। ইঁহার বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-ভুক্ত—একের সুখ দুঃখে যেন অপরের সুখ দুঃখ। পোষ্ট-মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাক্তার বাবু সাতকড়ি মিত্র, স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু শশধর রায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইঁহারা সকলেই সদাশয়, মিষ্টভাষী, সহৃদয়, এবং সচ্চরিত্র। যেমন কটক, তেমনি পুরী। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের নিকট সম্মান পাইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম।

সেই রাত্রেই সেই প্রলুব্ধ অসহায়া রমণীদিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলি-

লাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন। পাণ্ডারা বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের জাতি ধর্ম্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাণ্ডাদের দুর্বৃত্ততার দুই একটী উদাহরণ ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সহৃদয়তার এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই যেন একাত্মক। বিজয় বাবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস। দেখিলাম, ভাবিলাম এবং আশ্চর্য্য হইলাম। পর দিন প্রাতে রমণীদিগের অনুসন্ধানে বাহির হওয়া যাইবে, ধার্য্য হইল। রাত্রেই সংবাদাদি লইবেন, কোন কোন বন্ধু ভার লইলেন।

পুরীর সাগর—সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ, পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। পুরীর শ্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পরিপূরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সাগর। অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনন্ত সাগরবৎ অনুপম কীর্ত্তি। শ্রীমন্দিরের সীমা আছে বটে, কিন্তু ভাব রাজ্যে, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহা অসীম। সীমায় অসীম, সান্তে অনন্ত, পুরীর মন্দিরে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পুরীর জগন্নাথদেব, কথিত আছে, ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হন। অনেক দর্শন এবং অদর্শনের পর যযাতি কেশরীর দ্বারা ৪০৯ শকাব্দে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্থাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেব ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া বর্ত্তমান পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির নির্ম্মাণে ১৪ বৎসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি আরো ৬০টী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীদারুব্রহ্ম নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পৌরাণিক মত, উৎকল দেশীয় মত, বৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দাঁতবংশের মত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তূপের সহিত ইহার বিশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ, এই তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুসুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্য পুরুষোত্তম

ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া দুই যুগল রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংযোজিত করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"*

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ রূপ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপূর্ব্ব শ্রীদারুব্রহ্ম গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের গঠন ও আকৃতি এবং পুরীর অন্যান্য সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। শঙ্কর মঠ নামে পুরীতে একটী মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধীগণের অগ্রণী। কিন্তু যাহাই হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও জগতে এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন। জাতিভেদ প্রথা জগন্নাথক্ষেত্রে নাই—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রসাদ উপভোগ করিলেও জাতি যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহ্ন। বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় চিহ্ন, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপদেশ যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন—জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণতি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন।—

"ক্ষমাই এ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।"

"স্বভাবই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।"

"ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর।"

---

* দারুব্রহ্ম ৫৪ পৃষ্ঠা।

"কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিও না।"
"অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ।"
"দীন দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।"
"নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।"
"মনুষ্য পশু ইত্যাদির জন্য পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর।"
"যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও জীব হত্যা করিও না।"
"পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।"
"পরদার করিও না।"
"মিথ্যা কথা বলিও না।"
"মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।"

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, অহিংসা-প্রধান। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ;—ক্রোশ-ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শাক্ত ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য যাজপুর (যজ্ঞপুর) হইতে পার্ব্বতী মূর্ত্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব যে অহিংসা-পরায়ণ দেব-মূর্ত্তি বলিয়া পরিকল্পিত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বে এখানে ভোগের প্রথা ছিল না। এ কথা কত দূর প্রামাণিক, বলিতে পারি না। আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু জটিল সন্দেহে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল।

"স্থাপত্য-কার্য্যে পুরীর মন্দির জগতে অদ্বিতীয়," বঙ্গবাসী এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন।* আমরা এ কথা স্বীকার করি না। পারিস নগরের এফেল টাউয়ার প্রভৃতির কথা এখানে তুলিতে ইচ্ছা করি না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সহিত কারুকার্য্যে পুরীর শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্য্যহীন বলিলেও অধিক বলা হয় না। এই শ্রীমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

* ১২৯৭ সালের ৭ই বৈশাখের বঙ্গবাসী দেখ।

কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ ;—কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ। কলিকাতার মনুমেণ্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় এক মাইল দূরে, প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির দুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্ব্বে কেবল এক স্তর মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্ম্মাণের তিন শত বৎসর পরে পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০।২৫ ফুট উচ্চ হইবে। এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা দেখা যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না।

বহিঃপ্রাচীরে ৪টী ফটক আছে। পূর্ব্ব দিকের ফটকটী বড়ই জাঁকাল। এইটীই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ মূর্ত্তি গঠিত দেখিতে পাইবে। চারিটী ফটকের চারি নাম। পূর্ব্ব "সিংহদ্বার," উত্তর "হস্তীদ্বার," দক্ষিণ "অশ্বদ্বার," পশ্চিম "খঞ্জদ্বার,"। "সিংহদ্বারে", সিংহমূর্ত্তি, "হস্তিদ্বারে," হস্তিমূর্ত্তি ও অশ্বদ্বারে "অশ্বমূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মূর্ত্তি নাই।

পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখেই "অরুণস্তম্ভ।" এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভটী কণারকের উজ্জ্বল চিহ্ন, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অরুণ-স্তম্ভের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্য্যে ভূষিত, তাহা লিখিয়া বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

যাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির স্বচক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, মন্দিরের কি অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল। কেমন যে সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলা-বন্দোবস্তে পাকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ; তাহা যে না দেখিয়াছে, সে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে ?

অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন-শালা, নৃত্যশালা প্রভৃতি লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির-ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ *—এত উচ্চে প্রকাণ্ড

* এই মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নাম নীলচক্র। ইহা অষ্টধাতুর রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেখিতে অলৌকিক সুন্দর। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দুর্বৃত্ত কালা পাহাড় এই চক্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই পাপ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র কথঞ্চিৎ বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল ; বহুকালাবধি এইরূপ বিকৃত অবস্থাতেই ছিল ; পরে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সবিস্ময়ে একথা জিজ্ঞাসা করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক একবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক দূর নির্ম্মিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে বালুকা রাশির উপরে আবার নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিত। এইরূপ করায় সময়ে সময়ে মন্দির অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং পরবর্ত্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবিষ্কৃত হইত। এ সকল কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না। নির্ম্মাণ-কৌশল এত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা সাধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পারে না। অরুণ-স্তম্ভের ন্যায় কণারকের আরো অনেক কারুকার্য্যপূর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কারুকার্য্যে কণারকের সূর্য্যমন্দির অদ্বিতীয়। অল্প মাত্র তাহার নমুনা যাহা ভোগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর-খোদিত এক একটী মূর্ত্তি ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে যেরূপ, পার্ব্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, পুরীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ তিন ধারের গাত্রে, সেইরূপ নৃসিংহ, বামন ও কল্কি অবতারের তিন বিরাট মূর্ত্তি সংলগ্ন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তব মূর্ত্তি যাজপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় কি না, সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন পুরীর শ্রীমন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য অশ্লীল-ছবি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা কন্যা, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া সে সকল কদর্য্য ছবি দেখা যায় না। মানুষের চিন্তায়ও তাহা স্থান পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির-গাত্রে দেদীপ্যমান*। এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পারিলাম না, কেহ

---

খুর্দ্দার প্রথম রাজা রামচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক উহার সংস্কার হয়। তাহার পর বিদ্যাসিংহ দেবের রাজত্ব সময় ইহার পুনঃ সংস্কার হয়। চক্র ওজনে ৪ মন ৩০ সের ১০ ছটাক ৩ কাঁচ্চা। পরিধি ৭ ফিট লম্বা, প্রস্তে ৪ ইঞ্চ, পুরু দুই ইঞ্চ; এইবার ইহার তৃতীয় সংস্কার। ইহাতে সর্ব্বরকমে ১৭৯:৵৯।• টাকা ব্যয় হইয়াছে।

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদর্য্য ছবির ব্যাখ্যা করিয়াছি বলিয়া সহযোগী বঙ্গবাসী আমাদিগকে প্রকারান্তরে গালি দিয়াছেন। আমরা "মূর্খ", সুতরাং পাণ্ডিত্যাভিমানী" বঙ্গবাসীর সহিত তর্ক বিতর্ক করা আমাদের পক্ষে সাজে না।

ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। জগন্নাথ দেবের রথবিহারের জন্য আর একটী মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অনুরূপে, দূরে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম গুণ্ডীচা বাড়ী। এই গুণ্ডীচা বাড়ীর মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন করিয়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট বেলী সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এরূপ কদর্য্য ছবি সকল কেন অঙ্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ বলিলেন এবং আমাদেরও বোধ হয়, এ সকল ছবি অনেক পরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তখনকার রুচি ইহাতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাদের মন বিচলিত হয় না, তাহারাই প্রকৃত জগন্নাথ-দর্শনের অধিকারী। সেরূপ অধিকারী কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে না, সেখানে অতি অল্প লোক। তবে অবশ্য, "বঙ্গবাসীর" কথা আমরা বলিতে পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাদুকা রাখিয়া মন্দির-প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বহু লোক ভোগ বিক্রয় করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক ঘৃত দীপ সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। আমরা নাটমন্দির হইয়া জগমোহনে (Hall of audience) গেলাম। মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগমন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, কার সাধ্য। সময়ে সময়ে সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায়। দোল ও রথযাত্রার সময় জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সাহায্যে শান্তি রক্ষা করেন। আমরা অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্দির অন্ধকারময়, দিবসেও বাতি জ্বালিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নির্ম্মিত। উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের একটী মাত্র দ্বার—তাহার সম্মুখে জগমোহন, তার পর নাট্য মন্দির, তার পর ভোগমন্দির ইত্যাদি। সূর্য্যালোকের সাধ্য কি, সে সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে। অহরহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্ত্তি দেখিলাম। পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। ৬০০০ লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথের প্রসাদে বিশ সহস্র লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্রীক্ষেত্রে ২৪ টী উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর

সমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রাতেই অধিকতর যাত্রী উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মহাত্মা "পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রকে আমরা, সেইরূপ, ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায় নাই। পুরীর রথযাত্রা, এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়। রথ খানি ৪৫ ফিট উচ্চ হয়। ৪২০০ বেতনভোগী লোকের সাহায্যে রথ গমন করে। সুতরাং কত কাষ্ঠের সাহায্যে যে তাহা নির্ম্মিত, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুনিলাম, রথনির্ম্মাণের কাষ্ঠের জন্য অনেক অরণ্য রক্ষিত রহিয়াছে।

পুরীতে যে ৫টি মহাতীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ। এতদ্ভিন্ন পুরীর প্রধান ধর্ম্মালয়—লোকনাথ, চৈতন্যের মঠ, স্বর্গদুয়ার, শঙ্কর মঠ, তোটাগোপীনাথ। এ সকল সম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব।

একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখা যায়। জগন্নাথের সেবার জন্য এক দল বেশ্যা রক্ষিতা আছে। বাঙ্গালায় যেমন পুরোহিত শ্রেণী, পুরীতে জগন্নাথের বেশ্যাশ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিস। রথ যাত্রার সময় মন্দিরের সম্মুখে ইহারা বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ন্যায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে বেশ্যার এরূপ অধিকার আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কেমন করিয়া এই প্রথার আবির্ভাব হইয়াছে, অনুমান করা কঠিন। বোধ হয়, ইন্দ্র সভার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেশ্যাশ্রেণী সমাজে বিশেষরূপ আদৃতা হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা বহু লোকের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে। পুরীর প্রধান পাণ্ডাগণের দূষিত চরিত্রের কারণ যে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব? পুরী—শ্রীক্ষেত্র, কিন্তু হিসাবান্তরে পুরী অধর্ম্মের লীলাস্থল। পুরীতীর্থ হইতে চরিত্র ও কুলধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা নারী হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা। শুনিয়াছি, পুরী ব্যভিচার-দোষে প্লাবিত। তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্য্য কথা শুনিলে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এখন অধর্ম্মের লীলাস্থল হইয়া ভারতের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে আমরা ৩।৪টী বন্ধু মিলিয়া সেই রমণীগণের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাঁহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা বলিলে চলিবে না। পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহাদের উপর সংবাদ লওয়ার ভার ছিল, তাঁহারা সংবাদ দিলেন যে, জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণে, কালীবাড়ীর নিকটে, যাত্রীনিবাসে তাঁহারা আছেন। যাত্রীদিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্ গৃহে কোথা হইতে কে আসিয়া রহিয়াছে, পরিদর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। ভোগ পরিদর্শনের জন্য, যাত্রী নিবাস পরিদর্শনের জন্য, উৎসবের সময় মন্দির রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, পালাক্রমে, পুলিসের সাহায্যে মন্দিরের শান্তি রক্ষা করেন। এ সকল বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘুষ নামক যে একটা পদার্থ আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, যাত্রীনিবাসে ১০ জনের স্থানে ২০ জন স্থান পায়, ইত্যাদি। আমরা নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলাম। লোকেরা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী চতুষ্টয় তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও সাক্ষাৎ হইল না। ইত্যবসরে আমরা কালীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম। আসিয়াও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার উপর চড়িল—রাস্তার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহারা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। অগত্যা ভগ্নমনে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

## পুরীর তীর্থের কথা।

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চক্রতীর্থ। তারপর দিন প্রাতে গুণ্ডীচা বাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নরসিংহমন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় জগন্নাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডীচা দেবীর নামে গুণ্ডীচা বাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। গুণ্ডীচা বাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু মন্দিরের

নানা বিভাগ ঠিক্ শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। ভোগ প্রস্তুতের গৃহগুলি ভিন্ন আর সমস্তই ইষ্টকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছবি বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাণ্ডা সমভিব্যাহারে যাত্রীগণ গুণ্ডীচা বাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক। অশ্লীল ছবিগুলি পাণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল; "এই দেখ, এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন।" এইরূপ কথা শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না! তাহাদের পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেই খানেই যাত্রীদিগকে "এই খানে কিছু চড়াও" বলিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। পয়সা প্রদানের এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এতভিন্ন প্রধান পাণ্ডাদের প্রাপ্য—সে ত স্বতন্ত্র কথা। শুনিয়াছি, কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন। গুণ্ডীচা বাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। গুণ্ডীচা বাড়ী এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানকার বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কল্কি অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন দর্শনে গেলাম। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে এই পুকুরের নামকরণ হইয়াছে। গুজরাটের যাত্রিগণ জলে যখন মুরকির মোওয়া ভাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক পাণ্ডা বিকট চীৎকার করিয়া নানারূপ সম্বোধনে কূর্ম্ম-অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কূর্ম্মগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পাণ্ডা মন্ত্র পড়িতে লাগিল, "মৎস্য, কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর জনার্দ্দন ইত্যাদি"। যাত্রিগণ এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র।—একটী প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইষ্টক দ্বারা তীর বাঁধা। শুনা যায়, ইহার মধ্যে কুম্ভীর আছে। এই পুকুরের মধ্যস্থলে একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী মেলা হয়, তাহাকে চন্দন যাত্রা বলে। ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ড।—এটী অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুর, এটীরও তীর বাঁধা, এটীও খুব প্রাচীন। এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে কালীয় দমন যাত্রা হয়।

শ্বেতগঙ্গা।—এটী সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও যাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন।

চক্রতীর্থ।—অথবা সমুদ্র। সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান্।

একদিনে এই পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর এতদূরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ভ করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্ধকারময় গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। এখানে শৈবধর্ম্মের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দেখিলাম। দুই চারি জন ভক্তের সহিত দেখা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয়।

তোটাগোপীনাথ।—একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ এইরূপ, এই খানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়। এসম্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া যায়; সেটী এই—

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথের ঘরে।"

এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না।

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গ-দুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্ত্তী একটা প্রশস্ত স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া পয়সা দিয়া থাকে।

ইহারই একটু দক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাধি-মন্দির। বৈষ্ণব-ভক্তগণের নিকট ইহা একটী তীর্থ। সমুদ্রের উপকূলে ইহা সংস্থাপিত। যত দিন ভারতে বৈষ্ণবভক্তগণের অধিষ্ঠান, তত দিন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের নাম অক্ষয়।

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে—তাহাতে বহু দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধান। এই বিমলা, যাজপুর অথবা বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়া-

ছেন। শাক্তধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলা মন্দিরে, মহাষ্টমীর দিন জগন্নাথ দেব যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলি হয়। পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের একমাত্র চিহ্ন—জাতিভেদের অন্তর্দ্ধান। শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ আব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মানুসারে প্রসাদ মন্ত্রপূত হয়, এই ধারণায় এখন আর ধর্ম্ম লোপ হইবে, এরূপ ভয়ের কারণ নাই। বিমলার মন্দিরের প্রাঙ্গণে রোহিণী-কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী "ভুষণ্ডিকাক" পড়িয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে।

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুল্যভয়ে সে সকল বিবৃত করিলাম না। বহুবার জগন্নাথ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, ১৫৪ বৎসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ৩ বার চিল্কাহ্রদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়; কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার,( এক কোটী টাকা ) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুক্তা এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। চূড়া সমেত ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ।

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে তিনটী রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সেই তিনটী রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগন্নাথের রথের নাম "নন্দীঘোষ," ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ "তালধ্বজ," ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

মহাত্মা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ উৎকলে আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবির্ভাব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাস; ১৪৩৩তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ হইতে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাসের পুরীর লীলা বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর উড়িষ্যায় থাকেন; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত চৈতন্যের উৎকল প্রচার; প্রতাপ রুদ্র দেব এই সময়ে রাজা ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বিষ্ণুপুরাণের সময়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন। এইরূপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য, কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্য্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেননা, এই সকলের নামেই এক একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ম্মব্যবসায়ীর প্রতাপ। যতই পুরীর বিষয় অনুসন্ধান করা যায়, ততই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বরাশিপূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান ভারতে দুর্লভ।

আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে কয়েকটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, "এই কয়েকটী অসহায়া মেয়েদিগের জন্য আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।" সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ঐ ব্যক্তি সব-জান্তা উপাধি পাওয়ার যোগ্য, কেননা, পুরীতে না যাইয়াও লিখিতে সাহস পাইল, "আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।" যাঁক। অনুসন্ধানে সেই কয়েকটী মেয়েকে পাওয়া গেল। তাহারা তখন এত দূর বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের কথা ও বাদ প্রতি-বাদ শুনিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক ষণ্ডামার্ক সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা কলিকাতায় পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোন খবর পাই নাই। তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে দুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থ স্বামী এক জন প্রাচীন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনিলাম, শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। মঠধারী সন্ন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী আরো সন্ন্যাসী হইবার জন্য চলিয়াছেন—যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও

ছিঁড়িতেছেন; এই জড়বাদের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাঁহার অলৌকিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। তার পর আমরা তাঁহার আদিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

শঙ্করের মঠ—বালুকা-গুহার মধ্যে নির্ম্মিত। সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত বালুরাশি—তাহার মধ্যে একটা গর্ত্তের ন্যায় স্থানে এই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি আছে। মন্দিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তদ্দ্বারা শিষ্যবর্গের কোন রকম ভরণপোষণ হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন। তীর্থস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন; তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়; তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম। তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের এইরূপ মর্ম্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

১। এক অদ্বিতীয় দেবতা ভিন্ন জগতে দুই নাই। যত দিন মানুষ মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ। মোহ ছিন্ন হইলে—অদ্বৈতভাব প্রাণে উপস্থিত হয়।

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। ইন্দ্রিয়-মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল।

৩। "আমিই সেই"—অদ্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল "তিনি আছেন"—এই মত। আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম্ম।

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড সহায়। শেষে কর্ম্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের জগন্নাথদেবকে মানেন?

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—'না—আমি মানি না।'

আমরা।—তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন?

তিনি।—লোকদিগকে দেখাইবার জন্য। আমি না যাইলে অনেকের অবিশ্বাস হইবে।

আমরা।—ধর্ম্মে কপটতা ভাল কি?

তিনি।—ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে আর থাকে না।

আমরা।—এই রূপে কি থাকিবে?

তিনি।—থাকিবে, একটা ত ধরা চাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকটে পৌছিতে পারিবে।

আমরা।—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি?

তিনি।—দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, যাইতে পারিলে বাঁচি।

এই রূপ নানা কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের জন্য তাহাও করেন। তিনি সরলভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিলেন; ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া তিনি পূজাদি করেন না। এই মহাত্মার সংস্পর্শে যতক্ষণ ছিলাম, যেন স্বর্গে ছিলাম। যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, তেমনি অমায়িকতা; যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্ভবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অল্পই লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার—পুরীতে অনেক জিনিস আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

আর একটি কথা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একথাটী ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অনুরাগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়; কেহ বলেন, জগন্নাথের ঘরে; কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভক্তগণ পরি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহার অর্দ্ধানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; বড়ই আশ্চর্য্য।

আমরা সম্প্রতি শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা প্রভৃতি চৈতন্য-ভক্তি-প্রধান স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্থানই চৈতন্যদেবের লীলার ভূমি, এই সকল স্থানেই তাঁহার মূর্ত্তি ধূমধামের সহিত পূজিত হইতেছে। এই

সকল স্থানের কোথাও আমরা তাঁহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিতে ও ধর্ম্মপ্রচারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করেন। নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্যের ধর্ম্মকে এইরূপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনতা প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা বলিয়া এইরূপ একটী শ্লোক দেশে প্রচলিত আছে;—

"মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বোল।"

গোরাচাঁদের ধর্ম্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু গৌরচন্দ্রের নিকট এই রূপ একটী তর্জ্জা লিখিয়া পাঠান—

"আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল।
আউলকে কহিও কাজে নাহি কাউল।
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।"

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং বলেন "যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জ্জন দিতেছেন।" ইহার পর প্রায়ই যেখানে সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই জানে না। চৈতন্যের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। পুরী, চৈতন্যের অতি প্রিয় স্থান। এই কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ, কিন্তু দুঃখের বিষয়—পুরীতে চৈতন্যের তেমন কোন কীর্ত্তি নাই। পাণ্ডারা জগন্নাথের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলেন, "তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন।" ইহাতে জগন্নাথের মহিমাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি? পুরী—জ্ঞানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি। পুরী বিশ্বাসীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ—কেননা চৈতন্যের শেষ লীলাভূমি। পুরী, এ জগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র। কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের এরূপ উজ্জ্বল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল।

## উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিল্‌কাহ্রদ।

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্‌কাহ্রদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিল্‌কা বা কণারক যাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর ধরিয়া যাইতে হয়,—বাঁধা রাস্তা নাই, কোনরূপ চটী বা আশ্রয় নাই—মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই চিল্‌কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রের আহারান্তে আমরা দুই বন্ধু গো-যানে আরোহণ করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতালস্পর্শী বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়োয়ানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত রাত্রি মৃদু মৃদু ভাবে গরু দুটী চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরী-জেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, দুই ধারে সম-শ্রেণীতে পরস্পর-সংলগ্ন বহু মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ অপূর্ব্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দির—তাহার ধারেই তুলসী-মণ্ডপ; এতদ্ভিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটী একটী তুল্‌সী মণ্ডপ বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্রই শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, সেখানেও শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব-পরিবার দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-মূলক ধর্ম্ম যেন জ্ঞানীর জন্য নয়—কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য? উৎকল পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম্ম বাঙ্গালীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম্ম উড়িষ্যাকে অতি সুকৌশলে পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়

বটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকলবাসী ধর্ম্মপিপাসু, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মহীনতার রাজ্যে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালার মিথ্যা মোকদ্দমার বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে অতি কঠিন সমস্যায় নিমগ্ন করিতেছে। একথা কলিকাতার নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধেও খাটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত। কলিকাতা-নিবাসী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী যে কতদূর অধঃপতিত, যাঁহারা স্থিতচিত্তে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর উড়েদিগকে ঘৃণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডাদিগকে বাদ দিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীর-দুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। ভ্রূণ-হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যভিচার বল, এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও নীতিকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দিতেছে। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাগণ কতক সুরক্ষিতা; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর-প্রথা-হীনতা বর্ত্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে বালবিধবাদিগের ধর্ম্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় কোথায়? ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার ৮।১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততায় নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক চরিত্রহীন। যাহারা হরিমাইতির ন্যায় নয়, তাহারা প্রায়ই গুপ্ত প্রণয়ে অন্যত্র আবদ্ধ। সহর বা উপসহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেশ্যা অতি অল্প স্থানে থাকে, সুতরাং অশিক্ষিত ধর্ম্মহীন যুবকের যৌবন-মত্ততার জন্য যেন এদেশের হতভাগিনী বালবিধবাগণ বিদ্যমানা। যাহাদের মুখের দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকুলে

অবহেলিতা, শ্বশুরকুলে পরিত্যক্তা! হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে এ সংসারে যৌবন-মত্ত নররূপী পশু-গণ যেন কেবল বিদ্যমান! হায়! হায়! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বালবিধবা, পুরুষের প্রলোভনেই তাহারা স্বৈরিণী, কলঙ্কিনী, কুলটা। বালিকা-বিবাহ পুরুষ প্রচলন করিয়াছে, সুতরাং বাল-বিধবার স্রষ্টা তাহারা। বিপত্নীক পতি দশবার বিবাহ করিবে, সমাজে নিন্দা নাই; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক নাই; আর বাল-বিধবা—জীবনে কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে!! হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্তরিপু যুবকগণ যে দেশে অহরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা বিধবা সে দেশে কেমনে অবিচলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, তখন তাকেই বা রাখে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর এদেশের হতভাগিনী রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশ্যা—বালবিধবা। রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন হৃদয়-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত; কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, কাজে কর্ম্মে উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটী উদাহরণ দেখ—সম্মতির আইনের ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি; কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূমি! উৎকল-ভূমি আইনের পোষকতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটী উদাহরণ দিব। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, "কামিনীর কোল, মুখে হরিবোল" মতের জীবন্ত শিষ্য; কিন্তু যতদুর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। আমরা যতদুর অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক শ্রেণীকে ভিক্ষাকে সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গালার বৈষ্ণব

বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন। বাঙ্গালার সহিত উৎকলের তুলনা করিলে, একদিকে ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় প্রভৃতি কার্য্যে যেরূপ উৎকল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ত্ব দেখা যায়, বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল; অন্যদিকে ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল যেমন লালায়িত, বাঙ্গালা কদাচ সেরূপ নহে। বাঙ্গালার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্ন্যাসী, ধর্ম্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্ম্মকে জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা। চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গালাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্ম-সুহৃদ্ নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলকেই ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বোধ হয়, ইহারা সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের এক অপরূপ বিমল জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত আজ সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ দিতে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎকলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক পরিমাণে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে। উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইয়াছি, উৎকলের ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি। এমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-মাতোয়ারা প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল। তবে পুরীর পাণ্ডাদের কথা স্বতন্ত্র। পুরোহিত শ্রেণী সর্ব্বত্রই কলুষিত-চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্ব্বত্রই পাণ্ডারা দুরাচারী। উৎকলের পল্লীর দৃশ্য অতি মনোরম। বহু পল্লীতে ধর্ম্মের ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎকল আজও জীবিত। ধন্য উৎকল! ধন্য পুণ্যভূমি!

চিল্‌কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা অনেক অবান্তরিক কথার সমাবেশ করিলাম। অনেক পল্লীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমান। আমাদের আশা ছিল, সাতপাড়ার লবণ-আফিসে বেলা দুই প্রহরের সময় পৌঁছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে যখন দুই প্রহর অতীত হইল, তখন শুনিলাম, মানিকপাটনা ডাকঘর বা সাতপাড়ার লবণ-আফিস এখনও বহুদূর। দুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া বালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। সে দুর্গম পথে জল মেলে না, আহারের দ্রব্য কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দ্দমময় সামান্য জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ছিল, তদ্দারা এবং সেই কর্দ্দমময় জল দ্বারা আমরা সে দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। উত্তপ্ত বালুরাশির ভিতর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের ভিতরেও সুখ ছিল, কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও পর্ব্বতাকার বালুকার স্তূপ, কোথাও বায়ুতাড়নে বালুকাস্তরের তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজনে পাখী উড়ে না, গাভী চরে না, মনুষ কদাপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যই অতিক্রম করিতে হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দূর হইতে দুই চারিটী বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কোথায় চলিয়াছি, কোথায় সে রাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ আকুল হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাতপাড়ার রাস্তা সে ভাল জানে না, মানিকপাটনার পথ জানে। আমরা সাতপাড়া যাইব। সেখানে লবণের ইনস্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার নিকট আমাদের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু সাতপাড়া এখনও দূর। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমুদ্রের নির্ঘোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম, আমরা সাতপাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর সাতপাড়ার বেণী বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েক

খানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে যেন মরুভূমির ওয়েসিস্, অকূলের কূল, গভীর অরণ্যের আশ্রয়। গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন? আরো ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি স্থান না দেন! এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব? ভাবিয়া কূল পাইলাম না। এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বুঝিতে পারিবেন। ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেণী বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা, কেমনে জানিব? হঠাৎ সেই স্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত একজন বন্ধু। বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার জন্য সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর যত্ন ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গাড়ীর দ্রব্যাদি সহ আমরা সাদরে বেণী বাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম। বাঙ্গলাটী চিল্কার উপকূলে একটী উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় স্থানে নির্ম্মিত। তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিল্কা হ্রদ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, স্থানটী কতদূর মনোরম্য। বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণ দিক দিয়া একটী ছোট খাল সমুদ্র ও চিল্কাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিল্কা এবং সমুদ্রের মধ্যে এক খণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিল্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর বেণী বাবু জাগরিত হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। চিল্কাতে যত লবণের কারখানা আছে; ইনি তাঁহার কর্ত্তা। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল যত্ন, নিরহঙ্কার মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। তিনি সেখানে যেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় সযত্নে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ন্যায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখিলাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা নাই। "প্রচার" নামক বাঙ্গালা

মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য অনেক সংবাদ পত্র তাঁহার টেবিলে দেখিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত অনুরাগী। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল; তিনি দেশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। চতুর্দ্দিকের অতুল শোভা, অল্প জোৎস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর বিজ্ঞতাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল. এবং অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া মহাসুখে রাজশয্যায় শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকাশয্যার পরিবর্ত্তে এ কি! চক্ষের জলে সুস্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম।

পর দিন প্রত্যুষে বেণী বাবুর আদেশে এক খানি সুন্দর জালীবোট সুসজ্জিত হইল, ৬। ৭ জন মাঝী, আমরা দুটি বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিয়া বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি চিল্কা-হ্রদ দেখিতে নৌকা ভাসাইলাম। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল, সাগরগর্জ্জন ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল, আমাদের নৌকা পাল-ভরে চিল্কার বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। উত্তরে একটী ছোট দ্বীপে লবণের কারখানা ( Salt Factory )। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দ্বারা চিল্কার জল প্রবাহিত হইয়া দ্বীপে সূর্য্যপক্ক হইতেছে; সেই খানেই জল লবণে পরিণত হইতেছে। লবণের বর্ণ কর্দ্দমের ন্যায়, এই লবণ রাঢ় দেশে ও উৎকলে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের ধারে বহু এরা নামক সুন্দর পক্ষী সকল জলে ভাসিতেছে, দেখিলাম। এরার পালক সাহেবদিগের বড় প্রিয়, শ্বেত এবং লালবর্ণে পালকগুলি বিভূষিত। দেখিতে অতি সুন্দর। বড় মোলাম, রাজমুকুটের উপযুক্তই বটে। এই পক্ষীর পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চিল্কা হ্রদ, ২০০ বৎসরের উপর হইল, সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদ রূপে পরিণত হইয়াছে। জল সমুদ্রের জল অপেক্ষাও লবণাক্ত, কিন্তু জলের বর্ণ নীল নহে, ঘোলা পচা পুকুরের জলের ন্যায়। চিল্কার জল বড় দুর্গন্ধময়। চিল্কার উত্তর সীমায় খোর্দ্দা সব ডিবিসন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণের পাহাড়শ্রেণীর পর গঞ্জাম জেলা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অপ্রশস্ত

এক খণ্ড বালুকাময় জমী সাগর হইতে চিল্কাকে পৃথক করিয়াছে। চিল্কা ৪৪ মাইল দীর্ঘ। চিল্কার দৈর্ঘ্য, উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। উত্তরের প্রস্থ ২০ মাইল, দক্ষিণের প্রস্থ ৫ মাইল। পরিধি ৩৪৪ মাইল, বর্ষাকালে ৪৫০ মাইল হয়। * চিল্কা বড় গভীর নহে, অধিক স্থলই ৩ কি ৪ ফিট মাত্র, কোন কোন স্থল ৬ ফিট। মহানদী কৈয়াকৈ নদীতে, এবং কৈয়াকৈ দয়া এবং ভার্গবীতে পরিণত হইয়া চিল্কাতে পড়িয়াছে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে চিল্কার জল খুব লবণাক্ত হয়; বর্ষা সমাগমে জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয়। নদীর জলের আধিক্য বশতই এরূপ হইয়া থাকে। চিল্কার মধ্যে নলবন, পারিকোদ, চোয়া, দ্বারাচণ্ডী, চারা, টাঙ্গি, জারকোট প্রভৃতি বহু দ্বীপ আছে। পারিকোদে এক বিখ্যাত রাজার বাস। নলবন এবং পারিকোদ দ্বীপ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। চিল্কার চতুর্দ্দিকে ৭০০০ শিবমন্দির আছে, এইরূপ জনপ্রবাদ। হণ্টার সাহেবও এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা পালভরে বিদ্যুৎবেগে বহুদূর বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। মাঝিরা আমাদিগকে পাহাড়শ্রেণীর শোভা, দূরবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের শোভা উল্লাসে দেখাইতে লাগিল। আমরা অবাক্ চিত্তে সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। নৌকার চতুর্দ্দিকে নক্র, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তুগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে, ছুটাছুটি করিতে ও জলের উপর ভাসিতে লাগিল। বোধ হইল, আমাদিগের দর্শনে তাহাদের ক্ষুধা এবং লোভের উত্তেজনা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য নৌকার ধারে ধারে ঘুরিতেছে। এরূপ ভীষণ জলজন্তু আমাদিগের অতি নিকটে নিকটে বিচরণ করিতে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হইল, এক বার নৌকা খানি ঘটনাক্রমে জলমগ্ন হইলে, নিমেষে আমাদিগকে তাহারা উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে। এক দিকে এইরূপ বিভীষিকা, অপর দিকে চিল্কার অপরূপ সৌন্দর্য্য,—একদিকে সাগরগর্জ্জন, অপর দিকে অভ্রভেদী পাহাড়-শ্রেণীর অতুল শোভা—সেই দূরদেশে আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিল। আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া, প্রায় ১টা পর্য্যন্ত চিল্কাবক্ষে বিচরণ করিলাম। সে দিন জীবনে যে আনন্দ পাইয়াছি, এ জীবনে কখনও তাহা ভুলিব না।

* See Orissa by W. W. Hunter vol. 1. Page 18 and 19.

বেলা আনুমানিক ১ টার সময় আমরা বেণী বাবুর আশ্রমে প্রত্যাগত হইলাম।

যথাসময়ে বেণী বাবুর যত্নে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করিয়া, সূর্য্যের তেজ হ্রাস হইতে না হইতে, আবার চিল্কা তটস্থ এক উচ্চ ভূমির উপর যাইয়া বসিলাম। অপরাহ্নে চিল্কার যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। একদিকে সূর্য্যের কিরণ-ছটায় চিল্কার পশ্চিম তটস্থ পাহাড়গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দূর-দূর-অতিদূরের বৃক্ষাদিও অল্পাধিক পরিমাণে চক্ষুর আয়ত্বাধীন হইতেছে, পাহাড়-প্রাচীর-বেষ্টিত চিল্কা আপন গৌরবে বায়ুপ্রবাহে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে; অপর দিক্ হইতে অনতিদূরের সাগর গর্জ্জন দিক্ কাঁপাইয়া ছুটিতেছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য্য ত্রস্ত হইয়া ছুটিতে লাগিলেন, চিল্কা-বক্ষ ক্রমে ক্রমে আরক্তিম আভায় পরিশোভিত হইতে লাগিল,—বোধ হইল যেন সূর্য্য সাগর-গর্জ্জন-ভয়ে পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত হইতে ছুটিতেছেন। সে যে কি মনোহর চিত্র, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান বড়ই কঠিন।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, চিল্কা পরিম্লান হইল, কিন্তু এদিকে চন্দ্রমা সমুদিত। চাঁদের অমিয়ারাশি যখন চিল্কার বক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সে আর এক স্বর্গীয় দৃশ্য। শুনিয়াছি, এইরূপ দৃশ্যরাজির মধ্যে স্বর্গের দেবগণ বিহার করেন। আমরা নরকের কীট, কিন্তু আমরাও বিধাতার কৃপায় আজ সেই দেবধামে বিহার করিলাম, নৃত্য করিলাম,—মানুষের সাধ্য যাহা, সব করিলাম। সে দেবধাম অপবিত্র হইল কি না, জানিনা; কিন্তু এই এক দিনের জন্য অন্ততঃ আমরা পবিত্র জীবন লাভ করিলাম।

এই রাত্রেই আমরা আবার পুরী যাত্রা করিলাম। নব জীবন লাভ করিয়াছি—দেহ মন নব বলে বলীয়ান্, পথ-কষ্টে এবার আমরা তত মলিন হইলাম না। পর দিন অপরাহ্নে পুরীতে পৌঁছিলাম। যাত্রীতে পুরী তখন ভরিয়া গিয়াছে। যাত্রী-নিবাস সকল লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সকল নিবাসে পাশ দিতেছেন না; এজন্য অনেক যাত্রীকেই সমুদ্র-তটে বা বৃক্ষ তলায় আশ্রয় লইতে হইতেছে। লরেন্স জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার পর কয়েক বৎসর পুরীতে যাত্রীর বড় ভিড় হইত না বলিয়া যাত্রী নিবাসের লাইসেন্স লওয়া হইত না; এবার হঠাৎ আশাতিরিক্ত যাত্রী সমাগম দেখিয়া, নিবাসের অধিকারীগণ লাইসেন্সের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গবর্ণ-

মেণ্ট তাহাদের অসাময়িক হঠাৎ আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন; কাজেই বহু যাত্রীকে সমুদ্রতটে আশ্রয় লইতে হইল। কিন্তু সে বিধান ভালই হইল। মুক্ত বায়ুতে যাত্রিগণ দারুণ পীড়ার হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইলেন। যাত্রী সমাগম দেখিয়া এক দিকে আনন্দ, এক দিকে আশঙ্কা উপস্থিত হইল; সংক্রামক রোগের আধিপত্য বিস্তার হইলে পুরী বা পুরীর পথ নিরাপদ নহে। যাত্রীর ভিড়ে গাড়ী পাওয়া যাইবে না, সে আর এক ভয়। আমরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যে দু দিন রহিলাম, প্রাণ ভরিয়া পুরীর উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিলাম।

এই দুই দিন অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রের তটে কাটাইলাম। সমুদ্রের তটে সমুদ্রের বহু কীট-কঙ্কাল পাওয়া যায়। আমরা প্রাণ ভরিয়া কুড়াইলাম। পূর্ণিমার দিন সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতে সাগরের তটে যাইয়া বসিলাম;—কেবল দুটী বন্ধু! পৃথিবীতে এ দিন আর অন্য সঙ্গী ভাল লাগিল না, জীবনের গভীর শুভ মুহূর্ত্ত সমূহে একাকী থাকিতেই ভাল লাগে। একাকী আসা আর একাকী যাওয়া—বিপদে বা ধর্ম্মের অঙ্গনে আর কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়? আজ একাকী যাইতে পারিলাম না বলিয়া দুজন গেলাম। সন্ধ্যার পূর্ণিমার চাঁদ সাগর মাতাইয়া আকাশে উঠিলেন;—সে দৃশ্য দেখিয়া সাগরটা যেন জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবদেহ ধারণ করিয়া সচল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাগরের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইল, অন্য দিন যে পর্য্যন্ত তরঙ্গের অভিঘাত পৌঁছিত, আজ তাহা হইতে ৮। ১০ হাত উপরে আসিতে লাগিল। আমরা প্রথমে যে স্থানে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে সে স্থান ছাড়াইয়া ঢেউ উপরে আসিতে লাগিল। মৃত সাগর আজ জাগিয়াছে—সে ঐ আকাশের চাঁদকে যেন আজ গ্রাস করিবে। চন্দ্রমা সাগর-প্রণয়ে বিহ্বলা, নামিতে নামিতে অতি নিকটে আসিয়া লজ্জা প্রযুক্ত যেন আর নামিতে পারিতেছে না। বোধ হইল যেন চাঁদ সাগরের উপরে, অতি নিকটে ঝুলিতেছেন; আর উন্মত্ত সাগর উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস চড়াইয়া উর্দ্ধে ছুটিতেছে। ফেণায় ফেণায় সমস্ত নীল জলরাশি শ্বেত আভায় পরিপূর্ণ,—আমরা দুটী প্রাণী অবাক্ চিত্রে আত্ম হারাইয়া চকিতচিত্তে দেখিতেছি। কি দেখিতেছি? মর্ত্ত্যের দৃশ্য, না স্বর্গের দৃশ্য? আজ পাপ ভুলিয়াছি, রিপু ভুলিয়াছি, সংসার ভুলিয়াছি—আমরা আত্মহারা হইয়া উন্মাদ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তখন ছুটাছুটী করিতেছি। শুনিয়াছি, পূর্ণিমার সাগর উচ্ছ্বাসের আকর্ষণে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য পুরীর

রাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত ভাঙ্গিয়া পুরীতে লইয়া যায়, কেবল জগমোহন আছে, এবং সিংহ দ্বারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি অতি সুন্দর। নবগ্রহ—সপ্ত দিবসের প্রস্তর ফলক গুলি বড় সুন্দর। এই কণারকের সূর্য্য মন্দিরের নিকটে চন্দ্রভাগা মহামেলা হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের জনৈক বন্ধু যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলিয়া দিলাম।

"কণারকের সূর্য্যমন্দিরের শিল্প ও কারুকার্য্যের কথা আপনাকে আর কি জানাইব, যদি আপনি উৎকল ভ্রমণের সময় কণারকে গিয়া থাকেন—তবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় মাঘ মাসের সপ্তমীর দিন যান নাই। আমরা ইংরাজদিগের কৃত অনেক অট্টালিকা ও সেতু ইত্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হই বটে, কিন্তু কণারকের সূর্য্যমন্দির দেখিলে ও সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান হয় ও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। সে সব শিল্পকারেরা বা এখন কোথায়? আর কি যন্ত্র দিয়াই বা তাহারা এই সমস্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল? একবার যদি তাহাদিগকে বা সেই সমুদয় যন্ত্র দেখিতে পাই, তাহা হইলে সিবিল ও রয়েল ইঞ্জিনিয়ারদিগকে দেখাইয়া মনের কতকটা আপসোষ দূর করি। ইংরাজেরা অগ্নি বর্ষণ করিয়া এই অপরূপ মন্দিরের খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা যখন সূর্য্য মন্দিরের সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, বোধ হয় লক্ষাধিক লোক এই দেউলের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া, সকলেই রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের কোলাহল ও চতুর্দ্দিকের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা সকলে শশব্যস্তে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া, কি-একটী অমূল্য নিধির আশায় আপনা আপনি হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিতেছে। এরূপ এক স্থানে এত লোকের জনতা বা কোলাহল দেখিলে বা শুনিলে মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। আমরাও সেই সঙ্গে মিশিয়া একটী গাছতলায় দিনান্তের পর (আমার ক্ষুধা না থাকা সত্বেও) এক মুটা খিচুড়ি উদরে দিলাম। সেই মিষ্ট ব্রাহ্মণ সঙ্গীটী থাকায় আমাকে তত বিব্রত হইতে হয় নাই। এখান হইতে চন্দ্রভাগা, শুনিলাম, তিন মাইল হইবে; তখনি এক মুটা নাকে মুখে গুঁজিয়া অভীষ্ট স্থানাভিমুখে সেই কলদ্‌যানে যাত্রা করিলাম; আমরা সেখানে রাত্রি আন্দাজ প্রায় একটা দেড়টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম। এই তিন মাইল পথ কেবল এক হাঁটু বালি; আমাদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই বরকন্দাজ না থাকিলে সেই রাত্রে চন্দ্রভাগা পৌঁছান দায় হইত, কারণ গাড়োয়ানের সাধ্য ছিল না দু একটী লোকের সাহায্য বিনা গরুকে এক পদ অগ্রসর করে। সেখানে পৌঁছিবার পর রাত্রের কোন বিষয় জানিতে পারিলাম না, কারণ আমি এই তিন দিবসের মধ্যে সেই রাত্রে বেশ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, মন আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিলাম, আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আন্দাজ ২। ৩ বিঘা জমিতে স্বল্প জল রহিয়াছে, কোথায় ২ ফুট, কোথায় বা ২॥০ ফুট, কোথাও বা ৩ ফুট জল রহিয়াছে। নদীবক্ষে এত অনিম্ন ভূমিতে, বিশেষতঃ বালুকাময় প্রদেশে এরূপ জল থাকা কখনই সম্ভব হয় না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ জল সকল সময়ে থাকে কি না, কেহই ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, কারণ এই মাঘী সপ্তমী দিন ব্যতীত কেহ কোন দিন এ স্থানে আসে না। কি মনোরম প্রদেশ! ইচ্ছা করে, এখানে এক খানি পর্ণ কুটীর

রাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত ভাঙ্গিয়া পুরীতে লইয়া যায়, কেবল জগমোহন আছে, এবং সিংহ দ্বারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি অতি সুন্দর। নবগ্রহ—সপ্ত দিবসের প্রস্তর ফলক গুলি বড় সুন্দর। এই কণারকের সূর্য্য মন্দিরের নিকটে চন্দ্রভাগা মহামেলা হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের জনৈক বন্ধু যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলিয়া দিলাম।

"কণারকের সূর্য্যমন্দিরের শিল্প ও কারুকার্য্যের কথা আপনাকে আর কি জানাইব, যদি আপনি উৎকল ভ্রমণের সময় কণারকে গিয়া থাকেন—তবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় মাঘ মাসের সপ্তমীর দিন যান নাই। আমরা ইংরাজদিগের কৃত অনেক অট্টালিকা ও সেতু ইত্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হই বটে, কিন্তু কণারকের সূর্য্যমন্দির দেখিলে ও সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান হয় ও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। সে সব শিল্পকারেরা বা এখন কোথায়? আর কি যন্ত্র দিয়াই বা তাহারা এই সমস্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল? একবার যদি তাহাদিগকে বা সেই সমুদয় যন্ত্র দেখিতে পাই, তাহা হইলে সিবিল ও রয়েল ইঞ্জিনিয়ারদিগকে দেখাইয়া মনের কতকটা আপসোস দূর করি। ইংরাজেরা অগ্নি বর্ষণ করিয়া এই অপরূপ মন্দিরের খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা যখন সূর্য্য মন্দিরের সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, বোধ হয় লক্ষাধিক লোক এই দেউলের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া, সকলেই রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের কোলাহল ও চতুর্দ্দিকের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা সকলে শশব্যস্তে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া, কি-একটী অমূল্য নিধির আশায় আপনা আপনি হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিতেছে। এরূপ এক স্থানে এত লোকের জনতা বা কোলাহল দেখিলে বা শুনিলে মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। আমরাও সেই সঙ্গে মিশিয়া একটী গাছতলায় দিনান্তের পর (আমার ক্ষুধা না থাকা সত্বেও) এক মুটা খিচুড়ি উদরে দিলাম। সেই নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সঙ্গীটী থাকায় আমাকে তত বিব্রত হইতে হয় নাই। এখান হইতে চন্দ্রভাগা, শুনিলাম, তিন মাইল হইবে; তখনি এক মুটা নাকে মুখে গুঁজিয়া অভীষ্ট স্থানাভিমুখে সেই বলদযানে যাত্রা করিলাম; আমরা সেখানে রাত্রি আন্দাজ প্রায় একটা দেড়টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম। এই তিন মাইল পথ কেবল এক হাটু বালি; আমাদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই বরকন্দাজ না থাকিলে সেই রাত্রে চন্দ্রভাগা পৌঁছান দায় হইত, কারণ গাড়োয়ানের সাধ্য ছিল না দু একটী লোকের সাহায্য বিনা গরুকে এক পদ অগ্রসর করে। সেখানে পৌঁছিবার পর রাত্রের কোন বিষয় জানিতে পারিলাম না, কারণ আমি এই তিন দিবসের মধ্যে সেই রাত্রে বেশ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, মন আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিলাম, আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আন্দাজ ২। ৩ বিঘা জমিতে স্বল্প জল রহিয়াছে, কোথায় ২ ফুট, কোথায় বা ২॥০ ফুট, কোথাও বা ৩ ফুট জল রহিয়াছে। নদীবক্ষে এত অনিম্ন ভূমিতে, বিশেষতঃ বালুকাময় প্রদেশে এরূপ জল থাকা কখনই সম্ভব হয় না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ জল সকল সময়ে থাকে কি না, কেহই ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, কারণ এই মাঘী সপ্তমী দিন ব্যতীত কেহ কোন দিন এ স্থানে আসে না। কি মনোরম প্রদেশ! ইচ্ছা করে, এখানে এক খানি পর্ণ কুটীর

বাঁধিয়া থাকি। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এইটুকু জলে দুই দিন লক্ষাধিক লোক স্নান, নৃকর্ম কার্য্য ও পান করিতেছে, কিন্তু ঠিক্ পরিমাণেই আছে, বোধ হয় এতাধিক লোক একটী প্রকাণ্ড দীঘিতে এক এক গণ্ডূষ জল পান করিলে, সমস্ত ফুরাইয়া যায়, কিন্তু ইহা ঠিক সম পরিমাণেই আছে।

আজ মাঘ মাসের সপ্তমী তিথি, আজ রাত্রি চারিটা হইতে এই জলে প্রায় লক্ষাধিক উৎকল-বাসীদিগের স্নানের হড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে উৎকল ব্রাহ্মণেরা বাম হস্ত পাতিয়া অভীষ্ট মন্ত্র পড়াইতেছে। আহা কি মনোহর দৃশ্য! হিন্দুধর্ম্মের কি জলন্ত ছবি! কণিকার দুই একটী গড়-জাত রাজা তাঁবু ফেলিয়াছে এবং ঐ জলের খানিকটা স্থান স্নান করিবার জন্য পাঁতা দিয়া ঘেরিয়া লইয়াছে। কেবল মাত্র আমরা দুটী বাঙ্গালী, আর একটীও ত বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম না। তৎপরে আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অমনি হাঁটু গাড়িয়া এক রকম বিহঙ্গ-স্নান করিয়া লইলাম, তার পর লক্ষ লক্ষ প্রাণী সমুদ্রবক্ষের দিকে দৌড়িতেছে দেখিয়া, আমিও তাহাদের অনুগামী হইলাম। যাহা গিয়া দেখিলাম, এ হতভাগ্যের লেখনীতে বর্ণনা করা সম্ভবে না।

"হে আরাধ্য তপনদেব! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার করি! আজ কেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু-সন্তানগণ তোমায় দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া দিগদিগন্তর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধূলি-ধূসরিত কলে-বরে চন্দ্রভাগা গর্ভে, কখন তুমি তোমার শান্তিময়ী আগার হইতে মৃদু হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা দেখিবার আশায় নিমেষ-বিহীন-নেত্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ কি আর তোমার সুখপ্রদ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না? তবে বুঝি আজ অভিমান ভরে তোমার এই সুবিমল কান্তি দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেছ? তুমিত কেবল হিন্দুসন্তানের নও, তুমি যে সৃষ্টির সকল প্রাণীরই আরাধ্য, তুমি ক্ষণেক না তাকাইলে ধরণী যে লোপ পাইবে! তুমি তবে আজ তোমার জগদানন্দদায়ী আনন দেখাইতে এত বিলম্ব করিতেছ কেন? তবে বুঝি তোমার শান্তিময়ী প্রণয়িণীর ক্রোড়ে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছ? আজ অত গাঢ় নিদ্রাভিভূত থাকিলে তোমার এই যে লক্ষাধিক সন্তানগণ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইবে! এই যে দেখিতে পাইতেছি, তুমি তোমার প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া নবরঞ্জিতরাগে উকি ঝুকি মারিতেছ! আমাদের প্রতি এত বঞ্চনা করি-তেছ কেন? আমরা ত তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী নই? তুমি যে আমাদের আরাধ্য দেবতা! তোমার দয়া ত আমাদের প্রতি কখনও হ্রাস হয় না। না না, আমি না বুঝিয়া আপনা আপনি কত কি বকিতেছিলাম, এতক্ষণে বুঝিলাম।" আহা! যাহা দেখিলাম—প্রাণে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কবি হইলে কতকটা অঙ্কিত করিয়া আপনার পাঠক মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিতাম। তপনদেব যেন তাঁহার প্রিয়তমাকে অভাগাদিগকে দেখাইবার জন্য জাগাইতেছিল, আর বলিতেছিল, "উঠ উঠ কি অপূর্ব্ব আনন্দময় কোলাহল একবার দেখবে এস, তোমার কি মনে নাই আজ সেই মাঘী সপ্তমী, আমাকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নর নারী দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া ঐ চন্দ্রভাগা উপকূলে গললগ্নবস্ত্র হইয়া কেমন দণ্ডায়মান রহিয়াছে? আবার কি ভাবিয়া যেন প্রিয়তমাকে নিষেধ করিলেন—না না—একটু অপেক্ষা কর, কেন না—সমস্ত সন্তান সন্ততির কলুষিত গাত্র ধৌত হয় নাই। এস এস, এবার হয়েছে, আর আমি অপেক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছি না, তাহাদের কাতরতা দেখে রত্নাকর শশব্যস্ত হয়ে তাহার অসীম বাহু প্রসারণ করে হুহুঙ্কার গম্ভীর রবে বলছে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, তোমাদের আশা ফলপ্রদ হইবে।" সমুদ্রের ডাক ও তরঙ্গের সেই উত্থিত ফেনা দেখিলে মনে

হয়, বাস্থকী যেন জনতাভার সহ্য কর্তে না পেরে তাহার শত ফণা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রাস করতে আস্ছে। ওঃ।! কি ভয়ানক দৃশ্য, দেখিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

আহা! তার পর যাহা দেখিলাম, মন যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইতে লাগিল, তাহা আপনাদিগের ন্যায় কবি হইলে কতকটা প্রাণ ভরিয়া অঙ্কিত করিয়া আবাল বৃদ্ধ বণিতাকেই ক্ষণকালের জন্যও আনন্দে মাতাইয়া তুলিতাম। প্রথমে তপনদেব তাঁহার আদরিণীর বাম হস্ত ধরিয়া আধ আধ দেখা দিয়া বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, এত জনসমাজে তোমার যাওয়া ভাল নয়, তুমি তোমার আরামদায়ী আগারে অবস্থান করগে, আমি ধরণীকে পরিতুষ্ট করে আবার সায়ংকালে আসিয়া তোমার বদন সুধা পান করিব, এবং আমার ভক্তগণকেও বিরামদায়িনী নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতে অবকাশ দিব"—এই বলিয়া তপনদেব হৃদয়মুগ্ধকারিণীকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, আপনি পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশ হইলেন।

এমন নয়ন-তৃপ্তিকর দৃশ্য দেখিলে কাহার মন না আনন্দে উল্লাসিত হয়?

হে হিন্দুধর্ম্ম অভিমানিগণ! এক বার ক্ষণস্থায়ী শরীরকে কিঞ্চিৎ কষ্টে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক দিনের জন্যও বিধাতার শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া একবার মাঘী-সপ্তমীর দিন চন্দ্রভাগা উপকূলে আসিয়া দেখ, আমাদের ৩৩ কোটী দেবতার মধ্যে আজ আরাধ্য তপনদেব আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য কি ভাবে উদিত হইয়া, কি ভাবে তাঁর আরক্তিম কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতেছেন।

এই যে মাত্র চন্দ্রভাগা উপকূলে লক্ষাধিক প্রাণী কত দেশ দেশান্তর হইতে সমবেত হইয়াছে, দেখিলাম, এর মধ্যে সকলে কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে? জানা গেল যেন সকলেই এই মায়া পুষ্করিণীতে স্নান ও তপনদেবকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিল,—যেন তপনদেব ইঙ্গিত করিয়া ক্ষণেক বিষাদে কখন বা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল "তাহা ত পূর্ণ হইল? আর আমার কি আছে যে দেখিবে?" যখনই বিজাতীয় বণিক্‌গণ ভারতাভিমুখে বাণিজ্য যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, না জানি ভারত বক্ষকে কতই পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে। সেই অবধি আমার মন সদাই নিরানন্দ, সেই দিন হইতে তোমাদের আমার প্রতি তত শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, আর সেই দিন হইতে তোমাদের অশ্রুপাতের দিন আরম্ভ হইয়াছে। ওঃ! সেই দিনের কথা মনে হইলে তোমাদিগের নিকট মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। এক দিন আমি আমার রত্নমণ্ডিত চারুকার্য্য বিনির্ম্মিত ঐ কণারকের অট্টালিকার নিকট গিয়া দেখি, ম্লেচ্ছগণ দলবল সমেত পরিবেষ্টিত হইয়া জানি না—কি আশায়—তাহারা আমার অট্টালিকার অগ্নি গোলা বর্ষণ করিতেছে। তখন তোমরা আমার মুখের দিকে একবারও তাকাইলে না! বরং দেখিয়া বিস্মৃত হইলাম—কয়েকজন হিন্দু সন্তান তাহাদিগের নিকট আমার সুখময় অট্টালিকার অনেক সন্ধান বলিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আমার অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার মজা দেখিতে আসিয়াছে! এই সব দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম, আর সে দিকে না তাকাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের এক পার্শ্বে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! এখন আমি [কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তদপেক্ষা হৈম অট্টালিকায় অধিষ্ঠিত হইয়াছি; তোমাদিগকে জানাইতে ভয় করে, পাছে আবার তোমরা ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ কণারকের অট্টালিকার ন্যায় ইহারও ঐরূপ দুর্দ্দশা কর! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, জগন্নাথ দেবের প্রাচীরের পার্শ্বে

যে ক্ষণেক জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলাম, সেই যে গহ্বর আছে, সেখানে আমাকে কায়মনচিত্তে ডাকিলে আমি যেখানে থাকি না কেন গিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। এখন আমার ঐ কণারকের অট্টালিকার দিকে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়! এখান হইতে বেশী দূর নয়, ঐ ভগ্নাবশেষের ধ্বজা নাম মাত্র দেখা যাইতেছে, একবার দেখিয়া যাও, দুর্বৃত্তেরা মমতা-শূন্য হইয়া গোলা বর্ষণ করিয়া আমার মনোমুগ্ধকারী নয়নতৃপ্তিকর হৈম অট্টালিকা কিরূপ ভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! সেই অবধি আমি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছি; কাজেই ধরণীর দিকে প্রফুল্ল অন্তরে তাকাইতে কষ্ট বোধ হয়, আমার এতাদৃশ কাতরতা দেখে প্রিয়তম বরুণদেব আমায় সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য অহরহ আমার সন্নিধানেই আছেন, তাই তোমাদের এ দেশে এত হাহাকার ও কান্নাহাটী পড়িয়া গিয়াছে, যাহাকে তোমরা এখন দুর্ভিক্ষ বল,—আরো পরে তোমাদের অদৃষ্টে কিআছে"—বলিতে বলিতে যেন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে—পরে যেন ধরণীকে ধ্বংস করিবার জন্য আরক্তিম রাগে পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিলেন। তপনদেবের এই সব হৃদয় দ্রবীভূত ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, আর একবার ফিরিয়া যাইবার কালীন কণারকের সেই অর্দ্ধ ভগ্ন মন্দির দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুনরায় আর সে দিকে তাকাইতে মন সরিল না। রাত্রে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই অবধিই শেষ হইল। ইচ্ছা হইল, বাসুকির ফণার ভিতর গিয়া প্রবেশ করি, কিন্তু এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে, এত শীঘ্র সংসারেব এই তীব্র জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করিব?"

আমরা পূর্ণিমার পর দিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের দোলোৎসবের আভাস দর্শন করিলাম এবং এই দিনই পুরী পরিত্যাগ করিলাম। গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলিবার নাই। রাত্রে এক চটীতে আমাদিগের গাড়ী লাগিলে, আমরা একটী নদীতে হাত পা ধৌত করিয়া জলযোগ করিলাম। এই চটীর নিকটে দোল উৎসব হইতেছিল; আমরা প্রথমত গাড়ীতে বসিয়া দোলের গান শুনিতেছিলাম, শেষে উঠিয়া দেখিতে গেলাম। বহুদূর হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ সেখানে সমবেত হইয়াছে, উড়িয়া ভাষায় গান হইতেছে। গানের কিছুই আমরা বুঝিলাম না, তবে বিশেষত্ব এই, যখন গান হয়, তখন বাদ্য বন্ধ থাকে, আর যখন বাদ্য হয়, তখন গান বন্ধ থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থলে যেরূপ করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হয়, এখানে সেরূপ করতাল ব্যবহৃত হয় না, বড় বড় থালার ন্যায় ১০।১২ জন লোক কেবল করতাল বাজাইতেছে। সে যে কি বিকট বাদ্যের রোল, বর্ণনা করা অসাধ্য। ১০।১৫ মিনিটের রাস্তা পর্য্যন্ত এই বাদ্যের ধ্বনি ভ্রমণ করে। গানের উল্লাস বাঙ্গালী অপেক্ষা উৎকল-বাসীদিগের অনেক বেশী। দোল-যাত্রার সঙ্গীত শুনিয়া কোন ভাব না পাইলেও, নরনারীর আনন্দ উল্লাস দেখিয়া প্রাণে বড়ই সুখ পাইলাম, সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হইল না। শেষ

স্বাত্রে তীব্র শব্দ করিতে করিতে আমাদের গাড়ী আবার রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল,আমাদের গাড়ীর শব্দ এবং বিজনতা সম্ভোগ করিতেছিল,মধুর হইতেও মধুরতর দিগন্তব্যাপী সেই বাসন্তী পূর্ণিমা। পৃথিবীর সব ঘুমাইয়াছে—মানুষ ঘুমাইয়াছে,পাখী ঘুমাইয়াছে,পশু ঘুমাইয়াছে, বৃক্ষ ঘুমাইয়াছে—সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছে কেবল ঐ আকাশের নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। দিক্ ছাইয়া,আকাশ ছাইয়া,মাটী ছাইয়া খেলিতেছে,কেবল বিমল জ্যোৎস্না-রাশি। এমন একাধিপত্য আর দেখি নাই! এই অতুল শোভা দেখিয়া কে ঘুমাইতে পারে? এই বিমল রজত-নিশিতে আমরাও ঘুমাইতে পারি নাই।

পরদিন আমরা কটকে পৌঁছিলাম। অবশিষ্ট যাহা দেখিবার ছিল, কয়েক দিনের মধ্যে দেখিয়া লইলাম। কটক টাউন-হলে "সান্ত ও অনন্ত" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলাম এবং ছাত্র সমাজের সভ্যগণ সহ এক বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটী সুন্দর বাড়ীতে বিধাতার উৎসব সম্ভোগ করিলাম। কটকের অপূর্ব্ব শোভা স্বরূপ, বার্দ্ধক্যেও নবোৎসাহে মত্ত জগমোহন বাবু আমাদের সহিত থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় ভগবৎ প্রসঙ্গে কাটাইলেন। অপরাহ্নে আমরা সেই বাড়ীর ছাদে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কোন বাঙ্গালী বাবু, এই বাড়ীতে রজনী সম্ভোগ করিবার জন্য, বিলাসিতার নানা প্রকার উপকরণ লইয়া উপস্থিত। যে বাড়ীতে আমরা বিধাতার নামে উৎসব করিলাম, সেই বাড়ী অপবিত্র কার্য্যের লীলাক্ষেত্র, ভাবিয়া মনে বড়ই বেদনা পাইলাম। বাড়ী-রক্ষকের উত্তেজনায় আমাদিগকে শেষে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল।

আর যে কয় দিন কটকে রহিলাম, সে কয় দিন শ্রদ্ধেয় মধুসূদন বাবু বড় ব্যস্ত ছিলেন। তখন স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় কটকে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত। আমরা মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহের সাহায্যে এবং আরো কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া কটক পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

এইবার হাই-লেবেল কেনেল ধরিয়া আমরা বিরজা-ধাম জাজপুরে যাইব। স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু আমাদের সঙ্গ লইলেন। সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মধুসূদন রাও মহাশয়গণ ইনস্পেক্টর বাবুর সহিত চলিলেন। বলা বাহুল্য যে,যাত্রা মধুর হইল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা লিখিতেছি।

আমরা আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময় আহারের কার্য্য সমাধা করিয়া কটকের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি, জাহাজ ঘাট ছাড়িয়া মহানদীতে ভাসিয়া

কতকদূর গিয়াছে। ষ্টিমার পাইলাম না বলিয়া ক্ষোভ হইতে লাগিল। কিন্তু জাহাজের লোকদিগের অনুরোধে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে দেখিয়া জাহাজের গতি স্থগিত করিলেন। আমরা নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উঠিলাম। রাধানাথ বাবু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জাহাজ ধূম উড়াইয়া, জল নাচাইয়া, তট কাঁপাইয়া, বেগে চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে মহানদী ছাড়িয়া আমরা হাই-লেবেল খালে উঠিলাম। কোন খালের জল মহানদীর জল হইতে নিম্ন, কোন খালের উচ্চ—এই নিম্নতা ও উচ্চতা অনুসারে Low level ও High level খালের নামকরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন Coast canal আছে। কিরূপে নিম্ন জলরাশি হইতে উচ্চ জলরাশিতে জাহাজ উঠে, কিরূপেই বা নিম্নে নামে, বুঝান বড় কঠিন। একটু চেষ্টা করিতেছি। কেহ বুঝিবেন কি না, জানি না। খালের মধ্যে কতকটা ব্যবধান রাখিয়া, দুটী কবাটওয়ালা বাঁধ থাকে। প্রথম বাঁধের কবাট খুলিয়া দিলে,উভয় বাঁধের ভিতরের জল বাহির হইয়া যায় এবং যে নিম্ন-জলরাশিতে জাহাজ থাকে, তাহার সমান হয়। যখন জল সমান হয়, তখন জাহাজ চালাইয়া উভয় বাঁধের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং যে কবাট খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া অপর কবাট খুলিয়া দেয়। অপর কবাট খুলিবামাত্র ক্রমে উচ্চ খালের জল আসিয়া উভয় বাঁধের মধ্যে পড়িতে থাকে এবং নিম্নস্থিত জাহাজকে উচ্চ খালের সম-স্থানে তুলিয়া দেয়। বাঁধের জল যখন খালের জলের সমান হয়, তখন জাহাজ চলিতে থাকে। এই রূপ প্রণালীতে জাহাজ নিম্নে নামে ও উর্দ্ধে উঠে। পাহাড়ময় দেশে এই রূপে জল বাঁধিয়া,খাল দ্বারা চালাইয়া, কৃষিকার্য্য চলিতেছে এবং বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছে। ইহা গবর্ণমেণ্টের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। খালের জল কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন কেন? একথার উত্তর এই, উচ্চ ভূমিতে খালের জল উচ্চ এবং নিম্ন ভূমিতে নিম্ন রাখিতে হয়। এই খালের জল দ্বারা কৃষিকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কৃষকদিগকে এই জন্য জল-কর (একার প্রতি ১৷৷০ কি ২৲) দিতে হয়। জল-করে উৎকলে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ হয়।

আমাদের জাহাজ এই খাল ধরিয়া চলিতে লাগিল,আবশ্যকতা অনুসারে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া,বাঁধের পর বাঁধ পার হইয়া চলিতে লাগিল। রাধানাথ বাবুর হস্তে একখানি সংস্কৃত পুথি। তিনি ও ব্রহ্মমোহন বাবু উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লইয়া ছিলেন, আমরা নিম্নশ্রেণীর টিকিট লইয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকের পাহাড়শ্রেণীর

শোভা দেখিবার জন্য আমরা ডেকের উপর বসিয়াছিলাম। রাধানাথ বাবু আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া ডেকের উপর ছিলেন। তিনি দূর হইতে গণেশধাম দেখাইয়া আমাদিগকে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলিতেছিলেন। আমরা উৎকলের বিবরণ শুনিতে শুনিতে, চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে, দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা আকুয়াপদা পৌঁছিতে পারিলাম না। পৌঁছিতে রাত্রি হইল। এই স্থানে রাধানাথ বাবুর সহিত আমরা পৃথক্ হইলাম। আমরা জাজপুর যাইবার জন্য তিন জন আকুয়াপদায় অবতরণ করিলাম।

কটক যেমন মহানদীর উপরে, আকুয়াপদা সেই রূপ বৈতরণীর উপরে। কটকের ধারেই মহানদীতে বিস্তৃত বাঁধ, আকুয়াপদাতে বৈতরণী নদীতে বাঁধ। এই বৈতরণী জাজপুরের মধ্য দিয়া চাঁদবালী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে। আকুয়াপদার বাঁধের পশ্চিম দিকে বৈতরণীতে অনেক জল, পূর্ব্বাংশে সামান্য জল,—পশ্চিমাংশের জলরাশির কিছু কিছু বাঁধের ফাঁক দিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে পূর্ব্বদিকে পড়িতেছে—এই সামান্য প্রবাহ বৈতরণী-বক্ষের বালুকারাশির উপর দিয়া তির তির করিয়া যাইতেছে।

আমরা সেই রাত্রি আকুয়াপদায় কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষে জাজপুর পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। বৈতরণী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল। ৬।৭ মাইল পথ। আকুয়াপদা হইতে জাজপুর পর্য্যন্ত আর একটী খাল তখন নূতন খনিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য খোলে নাই, নচেৎ আমাদিগকে হাঁটিয়া যাইতে হইত না। উৎকলের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া, মধুসূদন বাবুর নিকট উৎকলের বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে (উৎকলে দেবর পতি), ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এ সকল কথা শুনিয়া অনেক ভাবিলাম, অনেক চিন্তা করিলাম। বাঙ্গালীরা অসভ্য বলিয়া উৎকলবাসীদিগকে নিন্দা করেন, সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক উন্নত, বুঝিয়া অবাক্ হইলাম। কপটতাশূন্য ধর্ম্মভাবে তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

# জাজপুর।

দশটা কি এগারটার সময় আমরা কটক জেলার সবডিবিসন জাজপুরে পৌছিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে, বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে এবং গল্প করিতে করিতে যাওয়ায় অনেক বেলা বাড়িয়া গেল। মধুস্থদন বাবু সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের আর কোন রূপ কষ্ট হইবার কথা ছিল না। জনৈক সদাশয় সব-ইনস্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। প্রখর রৌদ্রের তীব্রতেজে আমরা ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। জাজপুরের নারিকেলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হইল; এবং স্নান আহারে শরীর শীতল হইলে আমরা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। ইতিমধ্যে মধুস্থদন বাবুর ইঙ্গিতে, স্বতন্ত্র বাসায়, সায়ংকালের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

ঋষিকন্যা নদী হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত ৪টী তীর্থ-ক্ষেত্র। পার্ব্বতীক্ষেত্র—জাজপুর,১০ যোজনব্যাপী; হর-ক্ষেত্র—ভুবনেশ্বর; অর্ক-ক্ষেত্র—কণারক; কৃষ্ণক্ষেত্র—পুরী। বিরজা-ক্ষেত্র, রজঃশূন্যা দেবীর আবির্ভাব স্থান; এখানে দেবীর ধ্বংসকারিণী মূর্ত্তি। জাজপুরের কীর্ত্তিরাশি এখন অনেক মৃত্তিকা-গর্ভে,কিন্তু এস্থলে যাহা দেখিলাম, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, জাজপুরে প্রায় দশ সহস্র ব্রাহ্মণের বাস। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক স্থান দেখিলাম। যে সকল অপূর্ব্ব কীর্ত্তির ধ্বংস দেখিলাম, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। এক স্থানে দেখিলাম, মৃত্তিকা খুড়িয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, মূর্ত্তির উদর পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছে। এরূপ প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরাটমূর্ত্তি আমরা আর কখনও দেখি নাই। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইল। মস্তকের দৈর্ঘ্য,মাপিয়া দেখিলাম, ২॥ হাত। সমস্ত মূর্ত্তিটী প্রায় ১৩ হাত (২০ ফুট), মূর্ত্তির নাম শান্তমাধব। এত বড় মূর্ত্তি উত্তোলন করিতে গবর্ণমেণ্ট অকৃতকার্য্য হইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন। একখণ্ড প্রস্তরে এত বড় মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে পারে, পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

কণারকের যেমন অরুণস্তম্ভ, জাজপুরের তেমনি শুভস্তম্ভ। শুভস্তম্ভ প্রাচীন কালের এক অদ্ভুতকীর্ত্তি। মনুমেণ্টের ন্যায় আকাশস্পর্শী এক খণ্ড মসৃণ প্রস্তর, কারুকার্য্যের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য, সময়ের বক্ষে বহু যুগ যুগান্তর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক অপূর্ব্ব দর্শন! দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল।

আদালত-প্রাঙ্গনের এক স্থানে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সে সকল মূর্ত্তিই প্রকাণ্ড এবং কারু-কার্য্য পূর্ণ। বাঙ্গালাপ্রদেশে এরূপ একটী মূর্ত্তিও কোথাও দেখা যায় না। আমরা রাণী ভবানীর বড়-নগরের ভগবতী মন্দির দেখিয়াছি, রাজবল্লভের এবং তদীয় বংশধরগণের রক্ষিত প্রাচীন বিগ্রহসমূহ দেখিয়াছি; সে সকলের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি গণনায় আনা যায় না, সে সকলের অধিকাংশই ধাতু-নির্ম্মিত, কোন কোনটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত। রাজবল্লভের বংশধরগণের (জপসার বাবুদের) কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিনাশার গর্ভশায়ী হইয়াছে, একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ এবং আর কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত বিগ্রহ তাঁহারা মথুরাতে রক্ষা করিয়াছেন। সে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের। তাহাতে দেখিবার এবং ভাবিবার জিনিস থাকিলেও, মোহিত হইবার জিনিস নাই। কিন্তু জাজপুরের মূর্ত্তি সমূহ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটী দুটী নয়—এইরূপ বহুমূর্ত্তি প্রাঙ্গনে সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির নাম জানিতে চেষ্টা করিয়া জানিয়াছি, কোনটির নাম বারাহীমূর্ত্তি (মহিষাসনা), কোনটির নাম চামুণ্ডা, কোনটির নাম চতুর্ভূজা (হাটুতে বালক), কোনটির নাম ঐন্দ্রী (গজাসনা), কোনটির নাম কৌমারী (ময়ূর বাহনা), কোনটির নাম বৈষ্ণবী (গরুড়বাহনা), কোনটির নাম নারসিংহী, কোনটির নাম মহালক্ষ্মী (পদ্মাসনা)। এ সকল নাম ঠিক কি না, জানি না; নাম যাহাই হউক, এ সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি। এ সকলের ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যদি জাজপুরের দেব দেবীর ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, দেশের এক মহা অভাব দূর করা হয়। আমরা দুই একজন প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট কিছু কিছু বিবরণ অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় নাই, এজন্য উল্লেখ করিলাম না।

মুক্তিমণ্ডপ—এক আশ্চর্য্য জিনিস। ইহাও আদালত প্রাঙ্গনের নিকটে সুরক্ষিত হইয়াছে। শুনিলাম, ইহা যযাতি-কেশরীর ব্রাহ্মণগণের বিচার-স্থল। ইহা ব্রাহ্মণগণের তদানীন্তন কালের সঙ্গত-স্থল। এক দিকে প্রধান বিচারকের আসন, অপর তিন দিকে অন্যান্য বিচারকগণের (সালিসগণের) বসিবার প্রস্তর-নির্ম্মিত আসন সজ্জিত রহিয়াছে। সমগ্র-সঙ্গতস্থলটী রাস্তার সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সংস্থাপিত। ইহা দেখিলে জুরির বিচার-প্রথার অনুরূপ বিচার-প্রণালী যে ঐ অঞ্চলে প্রাচীন সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালের গর্ভে সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে কত কথা যে মনে জাগে, বিধাতাই জানেন।

জাজপুরের প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তু দশাশ্বমেধঘাট, বরাহমন্দির, জগন্নাথ-মন্দির, বিরজা-মন্দির ও শুভস্তম্ভ। বিরজামন্দির প্রধান তীর্থস্থল; করাল-বদনার ভীষণ সংহারমূর্ত্তি দেখিলে কত ভাব মনে জাগে। শুনিলাম, জাজ-পুরের বিমলা-মূর্ত্তি পুরুষোত্তমে নীত হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য লোপ করিবার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে ছত্রিশ জাতির অন্ন বিক্রীত হয়। সকলেই জানেন, পুরীতে জাতিভেদ নামক কোন পদার্থ নাই। জগন্নাথের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একত্র বসিয়া গ্রহণ করিতে হয়। জাতিভেদ নাশ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ চিহ্ন। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিও বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশ মূর্ত্তি। হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন-সময়ে শাক্তধর্ম্মের মাহাত্ম্য পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পুরুষোত্তমের জগন্নাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিমলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মূর্ত্তি জাজপুর হইতে নীত। সত্য মিথ্যা, বিধাতা জানেন। আমরা বিরজা-ধামের মহীয়সী কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া মোহিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

জাজপুর উৎকলের ৪র্থ নগর।—৬৩০ এবং ৬৫০ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দে চীন পরি-ব্রাজক এই নগর পরিদর্শন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে জাজপুর উড়িষ্যার রাজ-ধানী ছিল। এই সময়ে অযোধ্যা হইতে ১০০০ ব্রাহ্মণ আনীত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানের বিখ্যাত সমর এইখানে হয় এবং মহম্মদীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাজেরা এই স্থানের অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। জাজপুরের বরাহমন্দির ১৫০৪ হইতে ১৫৩২খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিমলা পুরীতে নীত হয়েন। এই সময়ে শৈবধর্ম্ম স্থলে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু গয়াসুরকে বধ করেন। জাজপুরের নদী বর্ত্তমান সময়ে কটক ও বালেশ্বর জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে। শিবের পর বিষ্ণু বা জগন্নাথের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ও জাজপুরের প্রাধান্য লোপ হইলে কটক রাজধানী হয়। মকর কেশরী কটকের বাঁধ প্রস্তুত করেন। জাজপুরে এক সময়ে ২১৬৯ ঘর এবং ৯১৮০ জন লোকের বাস ছিল। জাজপুরে পাঠানদিগের গোরস্থান আছে, ইহাতেই প্রতিপন্ন

See Orissa by W.W. Hunter, P. 240.

হয় যে, এখানে হিন্দু মুসলমানে সমর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে মসজিদও আছে। কিন্তু সে-সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

জাজপুরে ঊনকোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক লিঙ্গের বিশেষ নাম আছে। আগ্নেয়েশ্বর নামক মন্দিরের শিবলিঙ্গ দিবসের মধ্যে বহুবার রূপ পরিবর্ত্তন করেন। আমরা সেই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। এমন প্রস্তরে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়। কথিত আছে, এই সকল লিঙ্গের পাথর নীলগিরি হইতে আনীত হইয়াছিল।

সমস্ত মন্দিরের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। আমরা ঘুরিয়া ২ একে একে সমস্ত দেখিলাম*। ইহার মধ্যে একদিন জাজপুরে একটী মেলা হয়। এই মেলার সময় বহুদূর হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল; নদীগর্ভে বালুকাময় স্থান সমূহে অসংখ্য দোকান বসিয়াছিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কত রকম রকম লোক, কত রকম রকম ঘটনা দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম। জাজপুরে তীর্থ না করিলে হিন্দু যাত্রীর উৎকল-ভ্রমণ ব্যর্থ হয়। এখানে গয়াসুরের নাভিগয়া আছে, সেখানে পিণ্ড দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থ হিন্দুর প্রধান-তীর্থ। এখানে আসিয়া তীর্থ না করিলে হিন্দুর মুক্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। বিরজা-মন্দিরে বিরজা, গণেশ, ভৈরব ভৈরবী ও কার্ত্তিকমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দুর্গাপূজার সময় এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড একটী প্রধান তীর্থ। নৃসিংহনাথ মন্দিরে রঘুনাথ ও গরুড় মূর্ত্তি আছে।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা মোহিত হইয়াছিলাম, জাজপুরের সপ্তমাতৃকা দেখিয়া। একটি ঘরে সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে পূজা ইত্যাদির কোন চিহ্ন দেখিলাম না! সপ্তমাতৃকার ঐতিহাসিক বিবরণ শুনিলে এমন লোক নাই, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে। বিচিত্র ও অদ্ভুত কীর্ত্তি। চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী মাতৃকা নহেন। বিষ্ণুর শক্তি বারাহী, বৈষ্ণবী, ও নারসিংহী। সপ্তমাতৃকার নাম এই (১) বারাহী (২) ঐন্দ্রী, (৩) বৈষ্ণবী—ছায়াদেবী, (৪) কৌমারী, (৫) মাহেশ্বরী, (৬) নারসিংহী, (৭) ব্রাহ্মণী। এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তর-খোদিত, মনুষ্যের আকারে গঠিত। অপরূপ গঠন। দেখিলে মোহিত হইতে হয়।

জাজপুরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত অনেক বিষয়ের কথোপকথন

---

* See W.W.Hunter's Orissa, Page 953 to 961.

হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অমায়িকতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের উত্তেজনায় এখানেও আমাকে একটী বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছিল। জাজপুরে অনেক বিখ্যাত টোল আছে। আমরা দুই একটী দেখিতে গিয়াছিলাম। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে তাম্বুল(পাণ) দেওয়া এদেশের বিশেষ রীতি। পাণের খিলিতে উগ্র গুণ্ডি (গুড়ি বিশেষ) থাকে,পূর্ব্বে জানিতাম না। গুণ্ডি,তামাক ও নানা মসলায় প্রস্তুত। হঠাৎ এক বাড়ীতে খাইয়া আমরা হতচেতন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। পাণ খাওয়া উৎকলের বিশেষ রীতি। যে ব্যক্তি রোজ ৶১০ রোজকার করে, সেও রোজ ‹১০ পয়সার পাণ খাইবে। শুনিলাম, অতি প্রাচীন কালে পাণ খাওয়ার নিয়ম ছিল না। বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রথম বারুই উৎকলে যাইয়া প্রথম পাণের চাষ করে। ক্রমে ক্রমে পাণের চলতি হয়। এখন উৎকল পাণময় দেশ হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ ভাত না খাইয়া দুই দিন থাকিবে, কিন্তু পাণ বিনা একদিনও চলিবে না। পাণের এমন আধিপত্য কোন দেশেও দেখি নাই। জাজপুরের ব্রাহ্মণ-বসতি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভক্তি হয়। জাজপুরের ব্রাহ্মণ-বসতি দেখিলে উৎকলকে কেহই বঙ্গপ্রদেশ হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। জাজপুর কটকের শেষ উপসহরে এখন পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন অক্ষয় প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা মধুসূদন বাবুকে জাজপুরে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রক যাত্রা করিলাম। ভদ্রক যাইতে হইলে আবার আকুয়াপদায় ফিরিয়া আসিতে হয়। আমরা ভগ্নমনে, জাজপুরকে বিজয়াদশমীর প্রতিমাবিসর্জ্জনের ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া, আকুয়াপদা পৌছিলাম। রাত্রিতে জাহাজ যাইবে। আকুয়াপদার বন্ধুগণের যত্নে আহারাদি করিয়া খালের ইঞ্জিনিয়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের ভবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কারণ এই, রাত্রিতে যখন জাহাজ আসিবে, তখন তাহাকে ডাকিবেই ডাকিবে, তিনি সেই জাহাজে ভদ্রক যাইবেন। আমরাও তাঁহার সহিত গেলে ভালভাবে যাইতে পারিব, বন্ধুগণের ধারণা ছিল। বাস্তবিকও তাহাই। অন্নদা বাবুর ন্যায় অমায়িক লোক আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার ভবনে যাইয়া দেখি, তিনি আমাদের জন্য আহারের দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন। অবাক্ হইলাম। তাঁহার অতুল যত্নে কিছু গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার

অতুল যত্ন ও সেবার পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরকে বারম্বার ধন্যবাদ দিলাম। রাত্রে যখন জাহাজ লর্ক পার হইয়া খালে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল। আমরা তল্পী লইয়া তাঁহার সহিত জাহাজে উঠিলাম। তাঁহার কামরায় আমরা স্থান পাইয়া পরম সুখে রাত্রি কাটাইলাম। সমস্ত রাত্রি জাহাজ চলিল। পরদিন প্রত্যূষে ভদ্রকের ঘাটে জাহাজ পৌঁছিল। অন্নদাপ্রসাদ বাবু প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তীরে নামিলেন, আমরাও নামিলাম। এই-বার তাঁহার সহিত শেষ বিদায়। তিনি আমাদের মুখের দিকে বারম্বার চাহিয়া দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—"যা হউক, তবুও সাক্ষাৎ হইল।"

সমস্ত রাত্রি একত্রে কাটাইলাম, তখন সাক্ষাৎ হইল না, প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ হইল, এ কিরূপ কথা ? আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন সাক্ষাৎ হইল, একথা বলেন কেন ?' তিনি উত্তর করিলেন—'রাত্রির দর্শনে পরিচয় হয় না—মহা আঁধারে মানুষের আকৃতি বিকৃত হয় ; বাতির আলো-কেও প্রকৃত আকৃতি ফোটে না। রাত্রে সাক্ষাৎ হয় নাই,এখন প্রকৃত সাক্ষাৎ হইল'—এই কথা বলিয়া তিনি আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, আমরাও করিলাম। তিনি হাস্যমুখে বিদায় লইলেন, আমরা অপরিচিত স্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অমায়িকতা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্য স্থলে চলিলাম।

ভদ্রকের সবডিবিসনাল অফিসার বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের নামে পত্র ছিল, আমরা তাহা লইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম।

## ভদ্রক।

ভদ্রক বালেশ্বর জেলার একটী সব-ডিবিসন। সব-ডিবিসনে যাহা যাহা থাকে, এখানে সে সকলই আছে। ভদ্রক উপস্থিত হওয়ার পর, স্থানীয় অধিবাসীগণের বাহ্য বেশভূষা, আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের ধারণা জন্মিল যে, আমরা ক্রমে উৎকল পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গ-দেশাভিমুখে যাইতেছি। উৎকল কিরূপে বঙ্গ দেশের আচার পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছে,ভদ্রক উপস্থিত হইলে সে শিক্ষা কতক হয়। ক্রমে ক্রমে উৎকল,বঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, বালেশ্বরে। ভদ্রক হই-তেই দেখা যায়,আর অধিবাসীরা চুল কামাইয়া টিকী রাখে না, স্ত্রীলোকেরা তত গায়ে হলুদ দেয় না এবং বিস্তৃত কংস-বলয় ও কংস-মল ব্যবহার করে না—বস্ত্রাদিরও কতক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভাষার ত কথাই নাই—উৎকলের

অস্পষ্ট ভাষা ক্রমে বাঙ্গালীর নিকট সহজবোধ্য হইতেছে,আচার ব্যবহার বঙ্গানুরূপ হইতেছে। বঙ্গভাষা কিরূপে উৎকল ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, মেদিনীপুর গেলে তাহা বুঝা যায়, আবার উৎকলের ভাষা কিরূপে বঙ্গভাষায় পরিণত হইতেছে, ভদ্রক উপস্থিত হইলে অনুমান করা যায়। বালেশ্বর উপস্থিত হইলে, সন্দেহ জন্মে, এ বঙ্গপ্রদেশ না উড়িষ্যা? বঙ্গের মেদিনীপুর কতক উৎকলত্বে পরিণত, উৎকলের বালেশ্বর কতক বঙ্গত্বে পরিণত। উভয় স্থান দেখিলে ভাবিবার, শিখিবার, বুঝিবার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়।

বলিয়াছি, ভদ্রক বালেশ্বরের একটী সব-ডিবিসন,—পূর্ব্বে লবণের জন্য এই স্থান খুব বিখ্যাত ছিল। দেখিলাম,প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লবণের কারখানা এখন পরিত্যক্ত, ভগ্ন,পতিত। পতনের মহা আঁধার ভদ্রককে মলিন করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আর চলে না। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ আর কি!! এখন লিবরপুলের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি, উৎকলের প্রধান ব্যবসা এখন লুপ্ত! ভাবিলে কোন পাষাণ-হৃদয়ের চক্ষের জল না পড়ে? অত্যাচারের এমন জীবন্ত ছবি আর কুত্রাপি নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। শুনিয়াছি,উৎকলে যেরূপ লবণ প্রস্তুত হইত,লিবরপুলের লবণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। বিনা অপরাধে দেশের একটী প্রধান ব্যবসা গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত করিয়াছেন। ইংরাজ-রাজের এ কলঙ্ক দুরপনেয়।

কেবল ইহাই নহে। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগকে লবণ প্রস্তুত করার জন্য গুরুতর শাস্তি দিয়া থাকেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটু মাটী তুলিয়া জাল দিলেই লবণ প্রস্তুত হয়, মানুষের প্রধান ব্যবহার্য্য জিনিস সুলভে মিলে; গবর্ণমেণ্টের তাহা সহ্য হয় না। হঠাৎ যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তুত করে, তবে সে জন্যও তাহাকে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এমন মাস নাই, যে মাসে এই জন্য শত শত নিরন্ন কৃষকের কারাবাস বা অর্থ দণ্ড সহ্য করিতে না হয়। আমরা যখন ভদ্রকে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখনও এই অভিযোগে অভিযুক্ত ১০।১২ জন লোক আনীত হইয়াছিল। বিচারক দয়া করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দেশে তণ্ডুল সংগ্রহেও দারুণ কষ্ট, সে দেশে লবণের জন্য এরূপ গুরুদণ্ড যারপরনাই অবিবেচনার কার্য্য। এ জন্য পুলিসের যে কত অত্যাচার, যাহারা ভুক্তভোগী, তাহারাই জানে। ভদ্রক-যাত্রা আমাদিগের দারুণ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। দুঃখের কথা শুনিতে ২ হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কত উষ্ণ নিশ্বাস যে আকাশে বিলীন হইয়াছে, একমাত্র সর্ব্ব-

সাক্ষী দেবতা ভিন্ন কেহই জানে না। এইরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উৎকলবাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থের বেলায় গবর্ণমেণ্ট অন্ধ, উৎকলে এই ভেদ-নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের একান্ত পক্ষপাতী, কিন্তু উৎকলের লবণের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে সে দেশের কি মহা অনিষ্ট করিয়াছেন, এক কণ্ঠে গাইতে পারি না। যদি গবর্ণমেণ্টের কখনও পতন হয়, এইরূপ ভেদ-নীতিতেই হইবে।

ভদ্রকের কতিপয় শিক্ষক এবং ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলাপ করাই ভদ্রকের বিশেষ ঘটনা। দেখিবার আর বিশেষ কিছুই নাই। বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের সহৃদয়তা ও যত্ন আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

আমরা রাত্রে আহারান্তে গরুর গাড়ীতে বালেশ্বর যাত্রা করিলাম। বালেশ্বর ভদ্রক হইতে বহুদূর—৫০ মাইলের উপর পথ। মেদিনীপুর হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ভদ্রক এবং বালেশ্বরের মধ্যে। পথ সুন্দর, ৭।৮ মাইল অন্তরই চটী আছে; কিন্তু চটীতে প্রায়ই ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। এই সকল চটীর স্থানে ২ স্তূপাকারে নর-অস্থি রহিয়াছে, দেখা যায়। পুরীর যাত্রীদিগের মধ্যে যখন মারিভয় উপস্থিত হয়, তখন শৃগাল কুক্কুরের আহারের জন্য যেন শত শত মৃত এবং অর্দ্ধমৃত শরীর পরিত্যক্ত হয়! এমন নির্দ্দয় ব্যবহার! অথবা এমন ধর্ম্মানুরাগ! মারিভয়ের সময় আত্মীয়েরা আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করে, ইহা নির্দ্দয়তার উজ্জ্বল ছবি; কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সত্ত্বেও কত সহস্র সহস্র যাত্রী পুরুষোত্তমে যাইয়া থাকেন। কি গভীর ধর্ম্মানুরাগ! মানুষের নির্দ্দয়তা এবং মানুষের গভীর ধর্ম্মানুরাগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমরা বালেশ্বরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রিতে অতি অল্প পথ যাওয়া হইল। পরদিন প্রাতে কতক দূর যাইতে যাইতেই প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে গাড়োয়ান ও গরু কাতর হইয়া পড়িল। সুতরাং আমরা এক চটীতে মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বন্ধু বড় চতুর, তিনি মৎস্য কেনার ছল ধরিয়া পলায়ন করিলেন। আমাকেই রন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

## বালেশ্বর।

অপরাহ্নে আমাদের গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। পরদিন ৯টার সময় আমরা বালেশ্বর পৌঁছিলাম। বালেশ্বর আধুনিক সহর নয়। এখানে প্রায়-

হাট্টাদিগের মন্দির, ওলন্দাজ (Dutch)-দিগের খনিত খাল, কবর এবং কুঠীর ভগ্নাবশেষ আছে। ওলন্দাজ-কবরের একটীর উপরে ২৮শে নবেম্বর, ১৬৯৬ খ্রীঃ (Michillians Burggraaf Vanseven Huisenobut.) লেখা আছে। দ্বিতীয়টীতে Inbella 8y VLIA. লেখা আছে।

বালেশ্বরের পূর্ব্ব এবং উত্তরে একটী ছোট নদী আছে, ভাঁটার সময় এই নদীর স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া যায়। এই নদীটী অন্যান্য নদীর সহিত মিলিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বালেশ্বর সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় আফিসাদি বাদে, এখানে বিশেষ পরিচয়ের জিনিস বালেশ্বর-ব্রহ্মমন্দির, রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের রাজবাটী এবং দাস-পরিবারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিসনরীদিগের কীর্ত্তি-কলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে দাস-পরিবারের শুলুক জাহাজ সমুদ্র দিয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। আমরা যখন বালেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ভগ্ন শুলুক জাহাজ এই ক্ষুদ্র নদীতটে দেখিয়াছিলাম। এখন ষ্টিমার প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-পরিবারের ব্যবসা হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছে।

বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তির সমতুল্য কীর্ত্তি আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বাবু ভগবানচন্দ্র দাস, বাবু পদ্মলোচন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবন্ত দৃষ্টান্তে বালেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মপল্লী বিশেষ দ্রষ্টব্য। অনেক শ্রমজীবীর পরিবার এই পল্লীতে বাস করেন। এরূপ সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বালেশ্বর জেলাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান। উৎকল ভাষায় সংবাদ পত্র প্রচারের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন, স্কুলের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন, নানা সৎকাজে প্রচুর অর্থ দিতেছেন; এমন কি, ব্রাহ্মসমাজেও সময়ে ২ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত আমরা একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, তাঁহার সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া যিনি গরীব দুঃখীর কথা বিস্মৃত হন না, তাঁহার মহত্ত্ব অতুলনীয়। রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বালেশ্বরের মধ্যে বিশেষ গৌরবের জিনিস।

রাজা বৈকুণ্ঠনাথের রাজভবন একদিকে, অন্যদিকে বাবু পদ্মলোচন দাসের

আশ্রম। উভয়ই আমাদিগের নিকট বিশেষরূপ আদৃত। ধনীর ভবন এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীর—উভয়কে সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন? কারণ এই—দয়া দাক্ষিণ্যে রাজভবন এবং পবিত্রতা ও যোগ ধ্যানের সমবেশে এই দরিদ্র-আশ্রম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত। নদীর অপর তীরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম দেখিয়া আমরা যারপরনাই পুলকিত হইয়াছিলাম।

বালেশ্বরের জীবনী শক্তি বাবু ভগবানচন্দ্র দাস। ইঁহারই চেষ্টায় বালেশ্বরের পল্লীতে ২ ব্রহ্ম নামের বিজয় নিশান উড়িতেছে। দুঃখের বিষয়, আমরা যখন বালেশ্বর গিয়াছিলাম, ভগবান বাবু তখন ছিলেন না। এই দুঃখ বড়ই প্রাণে বাজিয়াছিল। বালেশ্বরের সহৃদয় বন্ধুবর্গের দয়ায় আমাদিগকে আহারাদির কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু বালেশ্বরে জাহাজ ধরিতে আমাদিগকে তিন দিন যারপর নাই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রত্যহ দিবসের এবং রাত্রের আহারান্তে আমরা জাহাজ-ঘাটে অপেক্ষা করিতাম। কিন্তু কোথায় জাহাজ? তিন দিন তিন রাত্রি আমাদিগকে জাহাজের অপেক্ষায় ঘাটে কাটাইতে হইয়াছিল, সে যে কি কষ্ট, ভাষায় ব্যাখ্যা হয় না। বসিয়া বসিয়া সারাদিন সারারাত্রি কাটাইতে হইত। সে কষ্ট ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। ইহার মধ্যে একদিন জাহাজ-ঘাটের নিকটে উৎকলের যাত্রা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম। যাত্রার বিশেষত্ব এই, গানের সময় গান, বাজনার সময় বাজনা; বাঙ্গলার ন্যায় গান বাজনা এক সঙ্গে হয় না; আর সেই কর্ণ-বধিরকারী প্রকাণ্ড করতালের ঝনঝনানি। ভাল বলি আর মন্দ বলি, এই দিনই যা কিছু সুখ পাইয়াছি, আর সব দিন কর্কশ, নীরস, শুষ্ক ভাবে জাহাজ-ঘাটায় সময় কাটাইতে হইয়াছিল। বালেশ্বরে কি জীবন নাই? এরূপ জাহাজের অনিয়ম কি তাঁহারা চেষ্টা করিলে দূর করিতে পারেন না? মানুষ কষ্ট সহিয়া সহিয়া শেষে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চেষ্ট, হত-চিত্ত হইয়া যায়; বুঝি বা বার মাস, এই জন্যই, বালেশ্বরবাসীরা জাহাজ-ঘাটার কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন। যাউক, সে কথায় কাজ কি?

চতুর্থ দিনে আমরা জাহাজ পাইলাম। জলকূলে যাইয়া নূতন জাহাজ ধরিতে হইল। এইবারে তীরবর্ত্তী-খাল (Coast canal) দিয়া আমরা মহিষ্যা-দল হইয়া গেঁয়খালিতে যাইব। এখানেও পূর্ব্বরূপ, খালের মধ্যে মধ্যে নদী। নদীতে যখন ভাটা থাকে, তখন খালে জাহাজ অপেক্ষা করে। বাঁধ দ্বারা খালের জল ঠিক রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু সুবর্ণ-রেখা নদী প্রভৃতিতে বাঁধ নাই; সুতরাং সময় সময় জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

ক্ষুদ্র জাহাজে বহু লোকের দুই তিন দিন অবস্থান যে কি কষ্টকর ব্যাপার, ব্যক্ত করা অসাধ্য। কষ্ট না সহিলে অভিজ্ঞতা হয় না, ভাবিয়া অম্লানচিত্তে এই দারুণ কষ্টও সহিয়াছিলাম। খালের দৃশ্য মনোরম—সোজা খাল, মধ্যে মধ্যে চটী আছে। চটীতে জাহাজ থামিলে মল মূত্র ত্যাগ ও আহারাদি সমাপন করিতে হয়। রাত্রের হিম, দিবসের উষ্ণতা—মানুষকে একবার জল করে, আবার শুষ্ক করে; জাহাজে কাজেই অনেক পীড়া হইয়া থাকে। শেষ দিন এক মুসলমান ভদ্র মহিলাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিয়াছিল। আমরা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিয়াছিলাম; কিন্তু শেষে গেঁয়খালিতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। আর একদিন কষ্ট সহিলে আমরাও পীড়িত হইতাম, এজন্য আমরা ঐ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া হীরক-বন্দর ( Diamond Harbour ) হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎকল-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল।

## উপসংহার।

ইচ্ছা করিয়াই আমরা সামাজিক বিষয়ে এবং উৎকলের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। উৎকলে বৈদ্য জাতি নাই; ব্রাহ্মণ, করণ, খণ্ডায়েৎ, মহান্তি প্রভৃতি জাতিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। করণ জাতি বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির অনুরূপ। খণ্ডায়েৎ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। গোলাম হইতে খণ্ডায়েৎ এবং খণ্ডায়েৎ হইতে করণের উৎপত্তি। খণ্ডায়েৎ, মহান্তি এবং করণদিগের বয়স্থা মেয়েদিগের বিবাহ হয়। বিধবার পূর্ব্ব বিবাহের পুত্র কন্যা, দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীকে খুড়া বলিয়া ডাকে। খণ্ডায়েৎদিগের স্ত্রীলোকেরা পুঁথি লেখে এবং পড়ে।

আমরা ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্টে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষায় উৎকল বঙ্গপ্রদেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাল পাতার পুঁথি পড়িতে প্রায় সকলেই পারে। উৎকল-ভ্রমণ করিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, সব বিষয়ে না হউক, অনেক বিষয়ে উৎকল বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা উন্নত। বন্ধুদিগের সাহায্যে উৎকলের ভাষা-সংস্কারকদিগের নাম ও বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কারণ এই, আসাম ও উৎকলের দেবমন্দির সমূহে যেরূপ সাদৃশ্য দেখিয়াছি, ভাষাতেও সেইরূপ সাদৃশ্য আছে; আসাম ও উৎকলের ভাষা বঙ্গভাষা হইতে পৃথক রাখা জাতীয় একতার পক্ষে বিশেষ

বিঘ্নজনক। মূলে তিন ভাষাই এক সংস্কৃত মূলক, এই তিন ভাষাকে পৃথক করায়, গবর্ণমেণ্টের (Divide and rule policy) বিভাগ করিয়া শাসনকরার নীতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের এক-জাতীয়তা গঠনের ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। উৎকল-হিতৈষী ব্যক্তি-গণ একথা চিন্তা করেন, একান্ত বাসনা। এ কথা ভারতের অসংখ্য জাতির অসংখ্য ব্যক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালী, প্রতিভা এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। শারীর বল, মনোবল, বুদ্ধিবল ও প্রতিভাবল চরিত্রের ভিত্তিকে অটল করিতে সমর্থ হইলে, তবে জাতির উত্থান হয়। বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া ভার-তের কোন সংস্কার হইতে পারে না। উৎকল এবং আসামবাসী ভ্রাতৃগণ এ কথাটী বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যা—এক রাজ্যের তিন শাখা, এক দেহের তিন অঙ্গ, এক জাতির তিন প্রাণ। তিনের ভাষা এক, এবং একের ভাষা তিন হইলে, এক অপূর্ব্ব নববলের সৃজন হইবে। কিন্তু ভেদ-নীতির বিস্তৃতির দিনে তাহাও কি হইবে?

উৎকলে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বংশানুক্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে উৎকলে কেয়া-বাঙ্গালী বলে। তাঁহাদিগের ভাষা, ভাঙ্গা বাঙ্গালা। ভাষা-কথনের দোষেই তাঁহাদিগকে কেয়া-বাঙ্গালী বলে। এই বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা অনেক। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা বাঙ্গালীদিগের ন্যায়। কাল সহকারে ক্রিয়া কর্ম্মাদি ওদেশেই করিতে হইতেছে। দিন দিন তাঁহাদের সমাজ খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা, উৎকলের হাবভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইলেও, পিতৃপুরুষের আচার, ব্যবহার ও ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কতক উৎকলত্বে পরিণত হইয়াছেন এবং উৎকলকে কতক বঙ্গত্বে রূপান্তরিত করিতেছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা জাতীয় একতার একটী সুমহান কার্য্য, অলক্ষিতভাবে, সাধিত হইতেছে। জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় জাতি-ভেদ। কেবল জাতিভেদ নয়, দেশভেদে সমাজ-ভেদও বটে। বাঙ্গালীর এক কায়স্থ সমাজের বিভিন্ন শাখায় আদান প্রদান চলে না, এমন কি, আহারাদিও চলে না। ব্রাহ্মণদিগের ত নির্দ্দিষ্ট ঘর ভিন্ন কুল রাখিয়া বিবা-হই হইতে পারে না। বাঙ্গালার কায়স্থদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের নানা শাখায় যখন বিবাহাদি চলে না, তখন ভারতের অন্যান্য দেশের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের

সম্ভূত হওয়ার ত কথাই নাই। আদান প্রদান ভিন্ন জাতীয় একতা সম্যক রূপে-সাধিত হইতে পারে না। আন্তর্জাতিক বিবাহের দ্বার না খুলিলে, যিনি যাহাই বলুন, এ ভারতের মঙ্গল নাই। আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা কি কখনও এ ভারতে প্রচলিত হইবে? আশা কম। তবে উৎকলবাসী বাঙ্গালীরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে এই অসম্ভব কতক সম্ভাবিত হইলেও হইতে পারে। জাতি-বিদ্বেষ প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর হইতে উন্মূলিত না হইলে, এ ভারতের কখনও মঙ্গল নাই।

উৎকলবাসী বাঙ্গালীদিগের উপর আমাদিগের অনেক আশা ভরসা। আসামবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আসামীয়দিগের ভাল ভাব নাই। পূর্ব্বতন কালে বাঙ্গালীদিগের দুশ্চরিত্রতার দরুণই, শুনিয়াছি, এরূপ হইয়াছে। জাতি-বিদ্বেষ আসামের অস্থিমজ্জা গ্রাস করিয়াছে। সেখানে বাঙ্গালীরা সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা আসামীয় বন্ধুদিগকে জয় করিতে না পারিলে, সেখানে জাতীয় একতার কোন আশা নাই। কিন্তু উৎকল সম্বন্ধে আমরা সেরূপ আশা-শূন্য নই। উৎকলবাসী বাঙ্গালীরা উৎকলে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদহীন নহেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উৎকলবাসীদিগকে যদি বাঙ্গালা ভাষায় দীক্ষিত করিতে পারেন, ভারতে এক অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইবে। আসামীয় বন্ধুগণ যেরূপ বাঙ্গালা-ভাষা-বিদ্বেষী, উৎকলবাসীরা সেরূপ নহেন। বাঙ্গালা ভাষা যদি উৎকলের গৃহকে অধিকার করিতে পারে, এক বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী উৎকল-বাসী ও বাঙ্গালীতে একতা অসম্ভব হইবে কেন? বিধাতা উৎকল-বাসী ও বাঙ্গালীকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করুন।

উৎকল ধর্ম্মে বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গে অনেকটা বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু উৎকলে প্রভূত পবিত্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। সহরের বা উপসহরের দুশ্চরিত্র মুটে মজুর দেখিয়া যেমন পবিত্র ও সরল বঙ্গ-কৃষকের অবস্থা জানা যায় না, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের উৎকলবাসীদিগকে দেখিয়াও, সেইরূপ, উৎকলের প্রকৃত চরিত্র জানা যায় না। সহরে যাহারা থাকে, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল এবং সমাজ-বন্ধনের অতীত হয়। কোন দেশের লোকচরিত্র বিচার করিতে হইলে, পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। উৎকলের পল্লীগ্রাম বঙ্গ-পল্লীগ্রাম হইতে উন্নত, আমাদের বিশ্বাস। আমরা সেই দিনের সুপ্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি, যে দিন বঙ্গবাসী ও উৎকলবাসী, পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, জাতীয় একতার পবিত্র দৃশ্য দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিবে। বিধাতা সেই দিন আনয়ন করুন।

সম্পূর্ণ।

টাইটেল এবং শেষ দুই ফর্ম্মা—১/১ নং শঙ্কর ঘোষের লেনে শ্রীউমেশ চন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক নব্যভারত(?)মতী প্রেসে মুদ্রিত। অন্যান্য ফর্ম্মা অবনী-প্রেসে মুদ্রিত।